মরণ যেথায় পদে পদে

(ছোটদের উপন্যাস)

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম : আট আনা

প্রিণ্টার
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট প্রেস
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পৃথিবীর সর্ব্ববৃহত্তম নদী আমাজনের আরণ্য-অঞ্চল আফ্রিকার জঙ্গল অপেক্ষাও গভীরতম এবং ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমাজন-অভিযানে আজ পর্য্যন্ত বহু মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। কত বৈজ্ঞানিক, কত ভূতত্ত্ববিদ, কত ভ্রমণকারী যে এখানে বেঘোরে প্রাণ হারাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এ'খানি দুঃসাহসের **কাল্পনিক** উপন্যাস হিসাবে পড়িলে ভুল হইবে। আমাজনের দুর্গম পথের কথা জগৎকে জানাইতে গিয়া যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদেরই মৃত্যু-অভিযানের ছায়া অবলম্বনে কিশোরদের জন্য এই কাহিনী উপন্যাসাকারে রচিত। ইতি—

বিনীত

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

উৎসর্গ

কালিয়ার সুসন্তান

জেমসেদপুরের সুপ্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী

পরমপূজনীয় দেব-চরিত্র বড়দাদা

শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্র নাথ হড় চৌধুরী, বি, এল,

মহাশয়ের

শ্রীচরণ কমলে—

প্রণত—শ্রীজ্যোতিষ

কালিয়া (যশোহর)
জন্মাষ্টমী, ১৩৪৭

মরণ যেথায় পদে পদে

মরণ যেথায় পদে পদে

— এক —

আমাজনের দুর্গম নদীপথ এবং আরণ্য অঞ্চলের সর্ব্বত্র এখনও মানচিত্রে ধরা পড়েনি। এখনও আবিষ্কার চলছে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর পথের বুকে আজ পর্য্যন্ত কত মূল্যবান প্রাণ যে নষ্ট হ'য়ে গেল, তা ভাবতেও বুকের ভেতর যেন কেমন ক'রে ওঠে, চোখে জল আসে।

ডাক্তার গার্ণার নামে একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক পাঁচজন সঙ্গী এবং একটি ইণ্ডিয়ান্ ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে একটি ছোট্ট দল তৈরী ক'রে আমাজনের জঙ্গলে রবারগাছের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি আর ফিরে আসতে পারেন নি। সঙ্গীদের ভেতর মাত্র একজন মৃতপ্রায় অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন, তা'ও তাঁদের সেই ইণ্ডিয়ান্ অর্দ্ধসভ্য ভৃত্যটির প্রাণান্ত চেষ্টায়। যিনি জীবন নিয়ে কোনমতে ফিরে আসতে পেরেছিলেন, তাঁর নাম ডেভিস্। ডেভিস্ সাহেব আজ পরলোকে। তাঁদের দুর্গম পথের কাহিনী শুন্‌লেও চম্‌কে উঠতে হয়। গা'য়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন :—

কেউ যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন, সত্যিকার সাহস দেখাবার এবং মৃত্যুর বুকের ওপর দিয়ে পথ তৈরী ক'রে এগোবার স্থান পৃথিবীতে কোথায় ?·········আমি বলব,—একমাত্র আমাজনের জলে ও জঙ্গলে।

আফ্রিকার ভীষণতার কথা অনেকের মনে উদয় হ'তে পারে, কিন্তু একমাত্র তাঁরাই বুঝবেন এ দু'য়ের ব্যবধান, যাঁদের পদরেখা উভয় জায়গাতেই প'ড়েছে। আফ্রিকা খুবই ভয়ঙ্কর—সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই,—কিন্তু জলে স্থলে শূন্যে পদে পদে এমন কঠিন মরণের বাঁধন সেখানে নাই।

কত ভয়ঙ্কর—কি ভীষণ মৃত্যুসঙ্কুল স্থান এ, তা কল্পনাও করা যায় না। ডাঙ্গায় 'প্যানথার' ও 'জাগুয়ার' নামে হিংস্র গেছো বাঘ, পিউমা নামে এক শ্রেণীর সিংহ, ছোট গণ্ডারের মত দেখতে 'টেপীর', শূকরের মত আকৃতি 'পেকারী' ইত্যাদি নানারকম জন্তু জানোয়ার বাদেও খুব ছোট থেকে একেবারে প্রকাণ্ড পোড়ো গাছের গুঁড়ির মত দেখতে অজস্র সাপের একচেটিয়া রাজত্ব। জলে অগুন্তি কুমীর ও ভীষণাকৃতি সব জলচর সাপ 'হা' ক'রে আছে সর্ব্বক্ষণ। শকুনির মত হিংস্র জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে দিনরাত উড়ে বেড়াচ্ছে, 'ভ্যাম্পায়ার' নামে রক্তপায়ী বাদুড়ের দল,—জীবন্ত মানুষের ও জন্তু জানোয়ারদের টাট্‌কা রক্ত পান করবার জন্যে। নিশাচর বাজের অত্যাচারই কি কম? সমস্ত গায়ে যেন কালিগোলা মেখে এক একটা বিরাট মূর্ত্তি নিয়ে গাছের ডালে ব'সে থাকে। মশামাছি পোকামাকড়ের অত্যাচার

আরও ভয়ানক—বোধ হয় এই সব জন্তু জানোয়ারের অত্যা-চারকেও ছাপিয়ে যায়। একটা পিঁপড়ের কামড়ে একখানা হাত একেবারে অবশ হয়ে পড়ে, যেন কেউটের ছোবল। মাছি গায়ে বস্‌লে মনে হয়, বোল্‌তা গায়ে হুল ফুটিয়ে দিল। এমনি ভয়ানক ওগুলো, আর দেখতেও রীতিমত বড়।

এইবার বল্‌ছি এখানকার মানুষের কথা। ঐ সব জন্তু জানোয়ারদের উপদ্রব অত্যাচারের কথা বাদ দিলেও আজ পর্য্যন্ত কত ভ্রমণকারী কত বৈজ্ঞানিক যে এই অঞ্চলের ইণ্ডিয়ান্‌দের হাতে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছেন তার সংখ্যা নাই। এঁরা অবশ্য ওদের হাতে বেশীর ভাগ মারা প'ড়েছেন নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতায়,—কারণ লোকে তাদের অসভ্য নরখাদক ইত্যাদি যতই বলুক না কেন, আমি নিজের জীবনেই পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, যে তারাও মানুষ। প্রয়োজন বোধে অপরের জন্যে তারাও প্রাণ দিতে পারে—কিন্তু তাদের একবার ক্ষেপিয়ে তুললে তাদের অত্যাচার হিংস্র পশুকেও ছাপিয়ে যায়। সভ্যতার আবরণে অসভ্যতা তারা শেখে নি।

এবার আমাদের পথের কাহিনী সুরু করলাম।

তখনও রেল লাইন হয় নাই। বোলিভিয়ার ভেতর দিয়ে যে নদীটা মূল আমাজনের আর একটা শাখায় গিয়ে মিশেছে, সংবাদ পেলাম, তার দুকূলে ঘন জঙ্গল প্রচুর মূল্যবান রবারগাছে ভর্ত্তি। আর সেই সঙ্গে এ খবরও কাণে এল, যে গত দশ বৎসরের মধ্যে যে কয়জন নির্ভীক মানুষ প্রাণের মায়া তুচ্ছ

ক'রে সে নদীতে নৌকো ভাসিয়েছিলেন,—তাঁরা কেউই আর ফিরে আসেন নি। তাঁদের যে কি হ'ল—কেউই তা জানে না।

• শুধু তাই নয়। কয়েকমাস থেকে রেলপথের বিভীষিকা অতি বড় সাহসীদের মনেও একটা আতঙ্কের ছাপ মেরে গিয়েছে। গত বছর 'ম্যাডিরা' নদীর ধার দিয়ে রেলপথ তৈরী করতে এসে একটী মার্কিন কোম্পানীকে কয়েক হাজার লোক এই আমাজনের কিনারায় বলিদান দিয়ে যেতে হ'য়েছে। কাজ আরম্ভ করবার পর থেকে কয়েকমাসের মধ্যেই শ্বেতাঙ্গ মজুররা মড়ক-লেগে—মরার মত একেবারে সাফ্ হ'য়ে গিয়েছিল। দুই একশ' মজুর যারা শেষ পর্য্যন্ত প্রাণ নিয়ে পালানই শ্রেয়ঃ মনে করল, তারা লোহালক্কড় যন্ত্রপাতি সব ফেলে রেখে পালিয়ে বাঁচল! এই হতভাগ্য মজুররা সবাই বিদেশে চাকরী করতে এসে মারা পড়ল, এ জঙ্গলের জন্তু জানোয়ার বা নররাক্ষসের হাতে নয়, বা বিষগাছের বিষাক্ত রস লেগেও নয়; এরা সবাই প্রাণ দিল—এ জঙ্গলের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর বিভীষিকা মশার হাতে—ম্যালেরিয়ায় ভুগে।

তা ভিন্ন এই নদীর ভীষণতা ও পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলের সম্বন্ধে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনলাম, যা শুনলে হয় আষাঢ়ে গল্প মনে ক'রে হো হো ক'রে হেসে উঠতে হয়, না হয় আতঙ্কে, বিভীষিকার স্বপ্ন দেখে শিউরে উঠতে হয়।

কিন্তু সাহসের যাদের সীমা নাই, মরা ও বাঁচার ওজন যাদের কাছে সমান সমান, বিপদকেই যারা বরণ করতে ভালবাসে,

অজানাকে জান্‌তে গিয়ে—তুঃখের শেষ ধাপে পৌঁছে, মরতে যারা আনন্দ পায়, তাদের ঠেকিয়ে রাখবে কে ?·········

নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে, সমস্ত জেনে শুনেও ডাক্তার গার্ণারের উৎসাহে আমরা একদিন,—একটী সুন্দর সকালে, হাত ধরাধরি ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে পড়লাম।

চার মাসের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য, তুই পাউণ্ড কুইনাইন্, সাতটি ভাল রাইফল্, প্রচুর কার্টিজ্, কম্পাস্, ফিতে, দা' কুড়ুল, দরকারী যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি সমস্ত নিয়ে আমরা প্রথমে ছোট্ট একটী খালের ভিতর নৌকো ভাসালাম। এই খাল ধ'রে বরাবর কিছুদূর গিয়ে আমরা গন্তব্য নদীপথ পাব এবং সেখান থেকেই হবে আমাদের প্রকৃত যাত্রা সুরু।

— তুই —

খালটা ছোট হ'লে কি হয় স্রোতের বেগ আছে রীতিমত। আমাদের নৌকোখানা আর বেয়ে নিতে হচ্ছে না, আপনা থেকেই স্রোতের বুকে গা ঢেলে দিয়ে তর্ তর্ শব্দে মোহানা লক্ষ্য ক'রে ছুটেছে। অর্দ্ধ সভ্য ইণ্ডিয়ান্ ভৃত্য মামারু পাকা মাঝি, হাল ধ'রে নৌকাখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঠিক মাঝখান দিয়ে চালাচ্ছে।

ডাইনে বাঁয়ে দুদিকে তাকালেই বুকের ভেতর যেন 'ছ্যাঁৎ' ক'রে ওঠে। বাপরে বাপ! জঙ্গল কি গভীর, কি নিবিড়, কি অন্ধকারময়! খালের দু'পাশে ঠাসাঠাসি জঙ্গল দূরারোহ খাড়াই পাহাড়ের মত মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। নৌকো থেকে জঙ্গলের ভেতর নজর চালিয়ে শুধু কালিমাখা আঁধার ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নজরে প'ড়ে না। চল্‌তি নৌকোর উপর ব'সে মনে হ'তে লাগল, যেন কোন্ অচিনদেশের অন্ধকার অজগরপুরীর দৃঢ় দুর্গের পরিখার ভেতর দিয়ে আমরা নৌকো বেয়ে চ'লেছি।

জলে ছোট বড় নানারকম মাছ ও কচ্ছপ ভেসে বেড়াচ্ছিল। দু'পাশ থেকে গাছের ডাল ও বুনোলতার ঝোপ জায়গায় জায়গায় জলের ভেতর এসে প'ড়েছে যেন খালের মুখ বেঁধে ফেল্‌তে চায়। কিন্তু খালটার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। কল্ কল্ শব্দে নির্ভয়ে আপনমনেই গান করতে করতে চলেছে।

কিছুদূর সাম্‌নে এগিয়ে খালটা ক্রমশঃ চওড়া হ'য়ে গিয়েছে মনে হ'তে লাগল। দুদিকে জঙ্গলের বেড়া সমানভাবেই পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। দিনের বেলাতেও মশার ভীষণ আক্রমণে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলাম। এই ক্ষুদে হিংস্র প্রাণীটীর অদ্ভুত ক্ষমতার কথা আগে থেকেই শুনেছিলাম, কাজেই সমস্ত শরীর যথাসম্ভব ঢেকে ফেললাম।

কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে? হাতে মুখে ঘাড়ের কাছে যেখানে ফাঁক পাচ্ছিল, সেখানেই কামড়াতে লাগল। উঃ,

যেন টক্‌টকে আগুনে কে আলপীন তাতিয়ে আমাদের গায়ে খোঁচা মারছে। একটুও চুল্‌কোয় না, কেবল 'রী' 'রী' ক'রে জ্বলে যায়।

নৌকোর মাঝখানে একটা মোটা টীনের চাদর পাতা ছিল। আমাদের একজন সঙ্গী বুদ্ধি ক'রে কয়েক টুক্‌রো কাঠ তার উপর জড়ো ক'রে একটু কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। দপ্‌ দপ্‌ করে আগুন জ্বলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা দিল। সে আগুন দেখে গাছের ডালে ডালে নানারকমের বানরগুলো হুক্‌ হুক্‌ শব্দ ক'রে লাফিয়ে লাফিয়ে জঙ্গলের আরও ভেতরে পালাতে লাগল। পাখীগুলো বিচিত্র সুরে রকমারি ডাক ডেকে উড়ে যেতে লাগল।

জঙ্গলের ভেতরে এ আগুনের আলো একটু ঢুকেছে মনে হ'তে লাগল। উঃ, সীমাহীন জঙ্গলের কি ভয়ানক রূপ! যেন কতকাল—কত যুগ আগে থেকে সূর্য্যের এর ভেতর প্রবেশ নিষেধ হ'য়ে গেছে। আবছা আলোয় তাকিয়ে দেখে মনে হ'তে লাগল, জমাট বাঁধা আঁধার ওর ভেতর মাথা খুঁড়ে মরছে। আলো!—একটু আলো—অন্ধকার কারাগারে থেকে থেকে জঙ্গলের আবহাওয়া পর্য্যন্ত আলোর রূপ ভুলে গিয়েছে।

ডাক্তার গার্ণার বললেন, "এই অঞ্চলে বর্ষাও যেমনি বেশী, বন্যারও প্রকোপ তেমনি। এই দুই কারণেই এখানকার জঙ্গলগুলো হ'য়ে ওঠে আরও ভীষণ। এখানে মানুষের পায়ের

দাগ এ জঙ্গলের জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত কোন দিন পড়েছে ব'লে মনে হয় না। হাজার হাজার বছর ধ'রে ডাল পাতা গাছ সব প'ড়ে প'ড়ে জমা হয়, তার ওপর বছর বছর বর্ষা আর বন্যার একগলা জল জ'মে জ'মে পচা পাঁকের সৃষ্টি করে। আমার ত মনে হয়, অবশ্য যে যতই বলুক, এই-ই হচ্ছে পৃথিবীর আদি জঙ্গল।"

সঙ্গী বন্ধুটী কি ভেবে হঠাৎ জ্বলন্ত আগুনের উপর খানিকটা জল ছিটিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দপ্ ক'রে উঠেই আগুন নিভে গেল। অমনি কুণ্ডলী পাকিয়ে রাশি রাশি ধোঁয়া উঠতে লাগল। যেন সাঁঝাল দেওয়া হ'য়েছে। ব্যাস্, আর কি! মশকবাহিনী ক্রমেই দলে পুষ্ট হ'য়ে আমাদের ঘেরাও করছিল, এবার ধোঁয়া-রূপী কামানের মুখে প'ড়ে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে কোন্ দল কোন্ দিকে পালাবে দিশে পাচ্ছিল না। আমরা যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলাম।

খালের দু'পাশে দৈত্যের মত দাঁড়ান গাছগুলোই বা কত রকমের! কোনটা থেকে ঝালরের মত ঝুরি নেমে ঝল্‌মল্ করছে, কোনটা থেকে মোটা লতাগুলো সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে এঁকে বেঁকে দোল খাচ্ছে, কোনটা আবার স্থির হ'য়ে ঝুলে আছে। দুই একটা খুব বড় লতা আবার গাছের গোড়া থেকেই অত বড় মোটা গাছটাকে একেবারে কঠিন বাঁধনে পেচিয়ে পেঁচিয়ে একেবারে মগডালে উঠে গিয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন বিরাটকায় অজগর তার শিকারকে কবলে পেয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধছে। এমনিধারা কত রকম দৃশ্য,

রাশি রাশি ধোঁয়া উঠতে লাগল। ····মশকবাহিনী···· ·(পৃঃ ৮)

কতরকম ছোটখাট জন্তু জানোয়ার দেখতে দেখতে এগোতে লাগলাম। আরও একদিনের পথ এগিয়ে খাল ব'লে আর চেনাই গেল না। এবার মনে হ'তে লাগল যেন কোন ছোট নদীর ভেতর দিয়ে আমরা নৌকো বেয়ে চ'লেছি।

গার্ণার বললেন, "নদী আর বেশী দূরে নয়। যে ভাবে আমরা চ'লেছি তাতে মনে হয় নির্ব্বিঘ্নে খাল থেকে বেরিয়ে যেতে পারব।"

বাঁদিকে জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা জাগুয়ারের পর পর দুটো ডাক শুনতে পেলাম। খুব কাছেই, বোধ হয় মানুষের গন্ধ পেয়ে বা আমাদের দেখতে পেয়ে ডেকে উঠেছে। কাল রাত্রেও এদের ডাক শুনেছিলাম।

গার্ণার বললেন, "এখানকার এই জাগুয়ারগুলো সত্যিই ভয়ঙ্কর। বিশেষতঃ এই ছোট খালগুলোর ভেতর দিয়ে যাতায়াত করা মোটেই নিরাপদ নয়। জানোয়ারগুলো যেমনি চালাক, গাছে চড়তেও তেমনি ওস্তাদ, শরীরেও রীতিমত শক্তি ওদের। ছোটখালের উপর গাছপালা প'ড়ে পথ প্রায় বন্ধ হ'য়ে থাকে, আর ঠিক এই সব জায়গাতেই ঝোপের ভিতর লুকিয়ে থেকে ওরা অসতর্ক মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ধ'রে খায়। এই ডোরাকাটা জানোয়ারগুলো রেগে গেলে যে কি ভয়ঙ্কর হয়, একবার তা টের পেয়েছিলাম। বন্দুকের গুলিতে ঘায়েল হ'য়ে যাবার পরও কি রোখ্! লাফিয়ে এসে ঘাড়ে পড়তে চায়।"

আমরা সবাই গার্ণারকে গল্পটা বলবার জন্যে অনুরোধ করছি, এমন সময় মামারু চীৎকার ক'রে উঠল, "নদী নদী।"

তাকিয়ে দেখলাম, নদী। আমরা সবাই আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠলাম। বাঁকের মোড় ফিরতেই পরিষ্কার দেখলাম, উত্তাল তরঙ্গময়ী বিরাট নদী হু হু করে ছুটেছে। যেন হুঙ্কার ছেড়ে আমাদের বলছে "নির্ব্বোধ যাত্রীদল! মরতে কোথায় আসছ?"

গার্ণার বললেন, "হুঁসিয়ার মামারু, সামনেই মোহানায় কিন্তু ঘূর্ণীপাক আছে। একবার তার ভেতর নৌকো পড়লে কিন্তু রেহাই কারুরই নেই।"

নির্ভীক মামারু হেসে হাল ধ'রে ব'সে রইল। দু'মিনিট পরেই নৌকাখানা যেন ধাক্কা খেয়ে খানিকটা পিছলে গেল, তারপরই এক পাক ঘুরে গিয়ে নাচতে নাচতে নদীর টানাস্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। নদীতে প'ড়ে আমরা আনন্দে আর একবার চীৎকার ক'রে উঠলাম।

গার্ণার বললেন, "আর মাইল দুই যেতে না যেতেই কিন্তু সূর্য্য ডুববে। যে রকম জঙ্গল দুদিকে দেখতে পাচ্ছি তাতে কিন্তু কাল সকালের আগে নৌকো কিছুতেই ভিড়ান যাবে না। শুধু জন্তু জানোয়ারের বিপদ নয়, এ নদীর দুদিকে সব জংলীদের আড্ডা আছে। ওদের পাল্লায় পড়লেই কিন্তু মুস্কিল আছে। বিনা কৈফিয়তে ওদের এলাকায় প্রবেশ কিন্তু ওরা বরদাস্ত করতে চায় না। ওরা ভাবে—হয়ত কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এরা এসেছে।

পড়ন্ত সূর্য্যের ম্লান আলো নদীর গেরুয়া রংএর জলের উপর পড়ে চিক্ চিক্ করছে। উভয় তীরে নিবিড় জঙ্গল পাল্লা দিয়ে চ'লেছে, আমরাও সাথে সাথে চ'লেছি, কিন্তু কোথায়? কোথায়?............

নৌকোর উপর ব'সে দেখতে লাগলাম, কতকগুলো কুমীর তীরে উঠে নির্ব্বিকার ভাবে বালুর ওপর প'ড়ে আছে। মাঝে মাঝে দুই একটা কচ্ছপ কিনারা দিয়ে হেটে বেড়াচ্ছে। কি বিরাট আকৃতি তাদের! মনে হয় একটা আস্ত মানুষকে গিলে খেয়ে ফেলতে পারে। এক একটা অনুমান মণ তিনেকের কম নয়।

এক ঝাঁক হলদে পাখী বড় বড় ডানা মেলে শোঁ শোঁ শব্দ করতে করতে উড়ে গেল। আর এক ঝাঁক্ পিছনে—আরও এক ঝাঁক্ তার পিছনে উড়ে আসছে। মুহূর্ত্তের জন্যে আমরা মুগ্ধ হ'লাম।

কিন্তু তখুনি নদীর বিচিত্র স্বরের গর্জ্জন যেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিল আমাদের যাত্রাপথের কথা। নানাভাবে নানা-ভঙ্গীতে যেন বলছে, 'কোথায় চ'লেছ উদ্ভ্রান্ত পথিকের দল? জলের উপর এ রংএর খেলা, এ পাখীর ঝাঁক সব মায়া সব মিথ্যে। একটু পরে এ রংএর খেলা থাক্‌বে না। পাখীর ঝাঁক ঐত আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল!—কিন্তু তোমরা?... যে পথে চলেছ, তার শেষ কোথায় জান? এখনও ভেবে দেখ তোমাদের অবস্থা! সুমুখে তোমাদের অনন্ত জলরাশির নিষ্ঠুর

বিভীষিকা, আর তারই দু'পাশে নিবিড় নিষ্করুণ জঙ্গল! কোথাও কিন্তু তোমাদের ঠাঁই নেই। জীবন মৃত্যুর মোহানা লক্ষ্য করে হাল ধ'রে ত বসে আছ, কেটে বেরিয়ে যেতে পারবে ত?.........

— তিন —

গার্ণারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, নিবিষ্টমনে কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ টানছেন, সম্ভবতঃ এ পথের একখানা ম্যাপ এঁকে নিচ্ছেন। মুখ না তুলেই ব'ললেন, "পঞ্চাশ মাইল পর্য্যন্ত দিব্যি রাতারাতি বেরিয়ে যেতে পারব মনে হ'চ্ছে। ঘণ্টায় চার পাঁচ মাইল বেগে এখন চ'লছে আমাদের নৌকো।"

সঙ্গীদের ভেতর একজন ছিলেন হাসির অবতার। নাম তার মরিস। মরিসের সাধারণ কথাবার্ত্তা শুনলেও হাসি পায়। এই কষ্টের পথে পা বাড়িয়েও ওঁর দয়ায় আমাদের মুখের হাসি কোন সময়েই মিলিয়ে যায় নি। মরিস্ ব'ললেন, "নৌকো পাঁচ মাইল বেগেই চলুক আর সিকি মাইল বেগেই চলুক, আমার কিছুতেই কোন আপত্তি নাই, তবে রক্ষে, যে আজ আবার খালের ভেতর রাতটা কাটাতে হবে না। বাপ্‌রে বাপ! মশা আর পোকা, কামড়ে একেবারে বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছিল আর কি! লোকে এ সব জঙ্গলে

বাঘ সিংহের ভয় কেন করে তাই ভাবি। তাদের জন্যে ত কত কায়দার সুন্দর সুন্দর বন্দুক বেরিয়েছে! বন্দুকের দু'ঘরে দুটো গুলি পুরে নাও।—হাঁটু গেড়ে বসে বন্দুকটা বগলে চেপে উঁচু করে তোল।—বাঁ চোখটা আস্তে আস্তে বুঁজে ঘোড়াকলে আঙ্গুল লাগাও,—নিশ্বেসটা একবার বন্ধ কর—তারপর ঘোড়ায় লাগাও টান!—ব্যাস্, তোমার আর কিচ্ছু করতে হবে না। আপনা থেকেই 'দুম্' করে শব্দ হবে, আর সে শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই জন্তু জানোয়ার যার গায়ে লাগবে একেবারে থপাস্ ক'রে প'ড়ে যাবে। তুমি নিশ্চিন্ত।—কিন্তু এই শয়তানগুলোর সঙ্গে কি ভাবে লড়া যায়? কামান দেগেই বা এর ক'কোটি মারা যায়?" সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠলাম।

অন্য একজন সঙ্গী বললেন, "এত হাসি কিন্তু ভাল নয়। অসভ্য জংলীদের সঙ্গে দেখা হ'তে কতক্ষণ! যতটা ভালভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়, সেই ভাল।"

আর একজন ব'ললেন, "হ'লই বা দেখা! মানুষের সঙ্গে মানুষ করবে আলাপ, এ ত পরম সুখের কথা। তাঁরা যদি দূর থেকে বিষাক্ত তীরের মারফৎ আলাপ জমাতে চান, আমাদের রাইফল্ও জোরগলায় তার উত্তর দিতে পারবে। ব্যাটারা শুধু ঘুঘুই দেখেছে, ফাঁদ ত কোনদিন দেখে নি.—এবার তা দেখবে।"

গম্ভীর স্বরে গার্ণার বললেন "বাস্তবিক আমরা—সভ্য-জগতের মানুষ ব'লে যারা বড়াই করি—সেই আমরা ঐভাবে ফাঁদ

দেখাতে গিয়েই ত হ'য়েছি ওদের দু'চোখের বিষ। ওদের এক-চেটিয়া দোষ দিলে চলবে কেন? আর ওদের ঐ তীরগুলো কি আপনাদের রাইফ্‌লের চেয়ে কিছু কম? বন্দুকের গুলিতে একটা অঙ্গ উড়ে গিয়েও অনেক সময় মানুষ বেঁচে যায়, কিন্তু ওদের ঐ তীরের ফলায় এমন উগ্র বিষ মাখান থাকে, যে, মানুষ ত দূরের কথা, জাগুয়ার পিউমা এমন কি বিষধর সাপের গায়ে লাগলেও তাকে একবারের বেশী দুবার আর নড়তে চড়তে হয় না। এ—ফোঁড় ও—ফোঁড় হয়ে তীর মারাত্মকভাবে গায়ে লাগবার কোন দরকার করে না। শরীরের যে কোন জায়গায় একটু ছোঁয়া লাগলেই যথেষ্ট। আর ঠিক এই রকম আত্মরক্ষার অস্ত্র ওদের না থাক্‌লে এই সব জঙ্গলে কি টিঁকে থাক্‌তে পারত এক মুহূর্ত্ত?”............

কথাটা যে একেবারে নতুন—কেউ কোনদিন শোনেনি, তা নয়। তবুও সবাই 'হাঁ' করে তা শুন্‌ল। বুকের ভেতরেও হয়ত কারু কারু একটু ধুক্ ধুক্ ক'রে উঠল। কিন্তু এ সমস্তই হাওয়ার মুখে উড়ন্ত মেঘের মত কোথায় চলে গেল এক মুহূর্ত্তে, মরিসের কথায়।

মরিস্ বল্‌লেন, “সে যাই হোক্, আমার কিন্তু একটা মস্ত বড় আইডিয়া—মানে একটা প্ল্যান রয়েছে।”

সবাই সমস্বরে 'কি' 'কি' ক'রে উঠল।

মরিস্ বল্‌লেন, “যদি ঈশ্বরেব কৃপায় পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে ফিরে যেতে পারি,তবেই ত আমার ইচ্ছেটা ষোলকলায় পূর্ণ হবে।

আমাদের ধৈর্য্য আর বাঁধ মান্‌ছিল না। বিরক্ত হ'য়ে বললাম, "আঃ, আপনার প্ল্যান্‌টাই আমাদের দয়া ক'রে একবারটী বলুন না!"

মরিস্ বল্‌লেন, "ফেরার পথে এমন এক রকমের একটী মানুষ এ জঙ্গল থেকে আমি ধ'রে নিয়ে যাব, যাদের মাথা নাই, যাকে বলে কবন্ধ। গলা থেকে সব বাদ।"

হাসির হর্‌রা ছুটে গেল। লোকটা বলে কি?

হাসতে হাসতে ডাক্তার গার্ণার বল্‌লেন, "ঠিকই বলেছেন মিষ্টার মরিস্, এদিকে কবন্ধ জাতীয় মানুষের বাস ছিল বটে, তবে সে ত এখন বা এখানে নয়। সে ত কাওরা নদীর তীরে,—তা'ও তাদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, এখন থেকে প্রায় তিনশ'বছর আগে। কিন্তু সে কথা যাক্, হঠাৎ আপনার কবন্ধ মানুষে কি প্রয়োজন হ'য়ে পড়ল?"

যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে মরিস্ বল্‌লেন, "প্রয়োজন না থাক্‌লে কি আর বল্‌ছি মশাই? আর এ নদীর তীরে যে তারা বাস করে না, এ কথার কি কোন প্রমাণ আপনি দিতে পারেন?"

এক গাল হেসে মরিস্ বল্‌লেন, "তা অবশ্য পারি না। তবে"—

বাধা দিয়ে মরিস্ বল্‌লেন, "ব্যাস্—ব্যাস্—তবেত আর কাজ নেই মশাই। আপনার দলে সখ ক'রে এসে ভিড়ে গেলাম ত ঐ একটী কবন্ধ মানুষের আশায়। কেন তা শুনবেন? আমার বহুদিন থেকে সখ, আমার বাড়ীর গেটে একটি কবন্ধ দরওয়ান সঙ্গীন ঘাড়ে ক'রে পাহারায় থাকে।"

হাসির একটা আস্ত বোমা যেন নদীর মাঝখানে ফেটে গেল। হেসে সবাই গড়াগড়ি দিতে লাগল।

মরিস্ এবার সত্যি সত্যিই চটে গেলেন, না চটবার ভাণ করলেন, বুঝলাম না। ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "আপনারা হাসছেন? হয়ত ভাবছেন বা মনে মনে বলছেন, 'কি এত তোমার ধনসম্পত্তি আছে হে বাপু, যে তার জন্যে আবার কবন্ধ দরোয়ানের দরকার হ'য়ে পড়েছে? কিন্তু আমি যে প্রচুর ধনের মালিক হ'য়ে এ জঙ্গল থেকে যেতে পারব না, তারই বা কি প্রমাণ আছে?"

গার্ণার বল্‌লেন, "তা—সুন্দর সুন্দর কাঠ আর দামী রবার যা আছে, তা যদি চালান দিতে পারা যায়, তবে বড়লোক হ'তে আর ক'দিনই বা লাগে!"

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে মরিস্ বল্‌লেন, "আরে ছোঃ, আমি যাব'খন কাঠ আর রবার টেনে নিতে এই ভুতুড়ে জঙ্গল থেকে! শেষটায় জীবনটা বেঘোরে হারাই আর কি ঐ করতে গিয়ে—! কেন—পৃথিবীর সেরা জিনিষটীর অভাব কি এখানে?—এর আশে পাশে চারদিকে যে সোণা আছে। আমি বেশী চাই না,—এই বড় বড় আট দশখানা চাঁই পেলেই আমার যথেষ্ট।

গার্ণার হেসে বললেন, "আজ অবিশ্যি ব্যাপারটা রূপকথায় এসে দাঁড়ালেও এমন একদিন ছিল, যেদিন পৃথিবীর লোকের ধারণা ছিল যে দক্ষিণ আমেরিকার এই সব জঙ্গলে যেখানে সেখানে সোণার পাহাড়—সোণার খনি প'ড়ে আছে। আর এই সোণার লোভে কত লোক যে এই সব জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে,

খেতে না পেয়ে, জন্তু জানোয়ার বা অসভ্যদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে, তার কি কিছু ঠিক আছে? বিশেষ ক'রে এখানকার 'এলডোর‍্যাডো' নগরীটা নিয়ে সমস্ত সভ্যজগৎ কি কাম্‌ড়া-কামড়ীই না ক'রেছে! সকলেই জান্‌ত, সেখানকার রক্তমাংসের মানুষগুলো বাদে আর সবই সোণা—শুধু সোণা। আঠে মাঠে রাস্তায় ভাগাড়ে আস্তাকুঁড়ের জঞ্জালগুলো পর্য্যন্ত সোণা। যাকে বলে সোণার স্বর্গপুরী।"

মাথা দুলিয়ে মরিস্ বল্‌লেন, "বলি মশাই, আমাজনের এই জঙ্গলগুলো তন্ন তন্ন ক'রে ত আর কেউ খোঁজ করেনি। আমাদের সাম্‌নে ভাগ্যক্রমে প'ড়েও ত যেতে পারে।"

হাসি চেপে গার্ণার বললেন, "কিছুই অসম্ভব নয়। বিশেষ ক'রে এ নদীটার সবটাই কি মানুষ জানতে পেরেছে? আমার মনে হয় এ নদীটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে যে বড়, শুধু তা নয়, এ আবার রহস্যময়ী। এই দেখুন না কেন, এর যে শাখাটার ওপর দিয়ে এখন আমরা চ'লেছি, এর রং গেরুয়া, আবার 'গুয়াসোর' নামে যে আর একটা শাখা আছে, তার জলের রং একেবারে দুধের মত সাদা। 'ব্রঙ্কোর' জল এত পরিষ্কার, এত নির্ম্মল—যেন স্ফটিক আগুনে গলিয়ে কে ঢেলে রেখেছে, আবার এর 'নিগ্রো' নামে যে বড়শাখাটা আছে তার জলের রং একেবারে কালিগোলার মত, একেবারে নিগ্রোদের গায়ের রং। এই 'নিগ্রো'র মাঝখান দিয়ে একবার ষ্টীমলঞ্চে পার হ'য়েছিলাম। এক জায়গায় মনে হ'য়েছিল যেন সমুদ্রের ভেতর দিয়ে

চ'লেছি,—তার একূল ওকূল কিছুই দেখা যায় না। আমার সঙ্গে ছিলেন একজন ইংরেজ বণিক। তিনি ব'ললেন, এখানকার একপার থেকে আর এক পারের দূরত্ব আট মাইলেরও বেশী। আণ্ডিজের এক উপত্যকার হ্রদ থেকে বার হ'য়ে এই নদীটা দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সমস্ত উত্তর ভাগটাকে শাখা-প্রশাখার বেড়াজালে ঠিক এইভাবে ঘিরে রেখেছে; আর দু'পাশে ঠাসা এই বিশাল জঙ্গল আগাগোড়া।"

তন্ময় হ'য়ে গার্ণারের কথা শুনছি, নৌকোখানা বাঁ দিকের কিনারা থেকে হাত পঞ্চাশ দূর দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ একটা আকাশ ফাটা গুরুগম্ভীর আওয়াজে একেবারে সবাই একসঙ্গে চমকে উঠলাম। পাখীর ডাক বটে, কিন্তু কি কর্কশ গম্ভীর!

মামারু ব'ললে, "নিশাচর বাজ, বাগে পেলে মানুষকেও ছাড়ে না।"

সূর্য্য মস্ত একটা রাঙা আগুনের গোলার মত জঙ্গলের গাছ-গুলোর মাথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এখুনি হয়ত টুপ ক'রে ডুব মারবে।

একেবারে কিনারার জঙ্গল থেকে আর একটা বুক কাঁপান গর্জ্জন শুনতে পেলাম। সবাই সেদিকে তাকালাম। মামারু ব'ললে, "পিউমা!—ঐ দেখুন আমাদের দেখতে পেয়ে কেমন জ্বল্‌জ্বলে চোখ মেলে জিভ বার ক'রে তাকাচ্ছে!" আমাদের একজন সঙ্গী বন্দুক তুলতে গেলেন। ইঙ্গিতে তাকে নিষেধ ক'রলাম। পিউমাটার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, কি ক্ষুধিত জ্বলন্ত দৃষ্টি ওর চোখ দুটোয়।
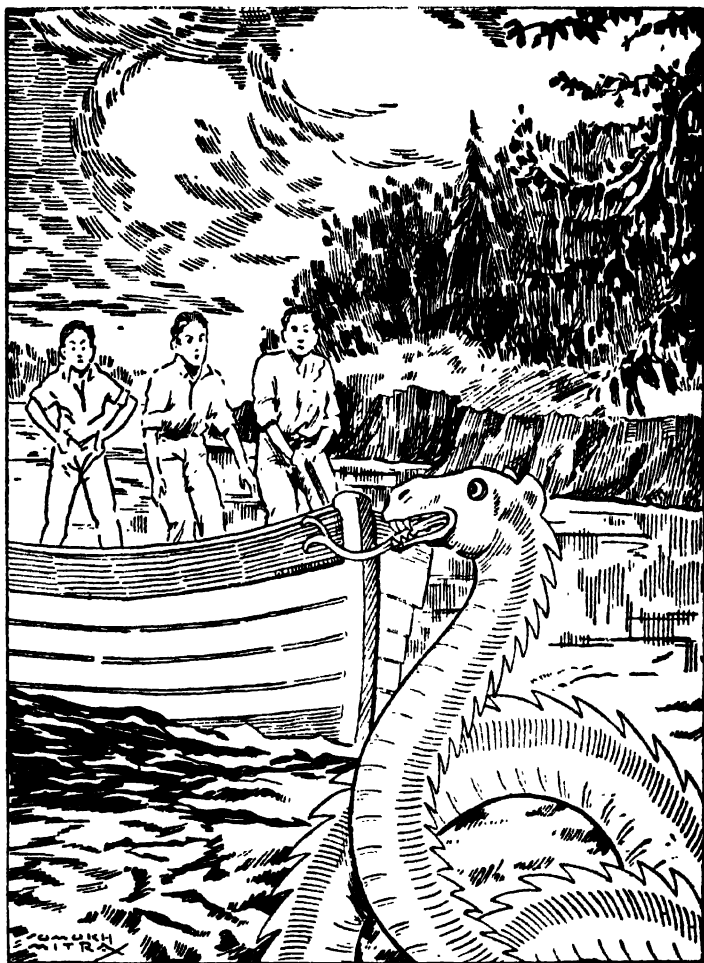
একটা প্রকাণ্ড সাপ, উটের মত মুখ তার,……(পৃঃ ১৭)

আমরা সবাই সেদিকে তাকিয়ে দেখছি, ঠিক এই সময়ে হালের মাঝি মামারু একটা ভীষণ চীৎকার ক'রে উঠল। সে ত্রাসের স্বর শুনেই চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমাদের বোধ হয় সকলেরই বুকের স্পন্দন একসঙ্গে থেমে গেল।

একটা প্রকাণ্ড সাপ, উটের মত মুখ তার,—ভয়ঙ্কর পাইথন্-এর মত কতকটা দেখতে,—উট যেমনিভাবে গলা বাড়িয়ে উঁচু গাছ থেকে পাতা টেনে খায়, তেমনিভাবে জল থেকে মুখ তুলে বিরাট 'হা' ক'রে আমাদের দিকে এগিয়ে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর গোলুই কামড়ে ধরল।

অতর্কিত আক্রমণে এক মুহূর্ত্ত হতভম্ব হ'য়ে গেলাম, তারপরই চট্ ক'রে রাইফল্ তুলতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই সাপটা মুখ দিয়ে নৌকো কামড়ে ধরে একদিকে কাৎ ক'রে ফেল্‌ল।

মুহূর্ত্তে গার্ণারের ও আমার রাইফল্ একসঙ্গে গর্জ্জে উঠল। এক ঝলক্ তাকিয়ে দেখলাম সাপটা ভীষণ আহত হ'ল বটে, কিন্তু এক প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে নৌকোখানাকে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে উপুড় ক'রে ফেল্‌ল

— পাঁচ —

সন্ধ্যার অন্ধকার। সেই বিপুল জলরাশির ভেতর কে যে কোন্‌দিকে ছিটকে পড়ল, কে যে নৌকোর তলায় চলে গেল, কারুর আর তা দেখবার অবসর হ'ল না। কে মরল, কে বাঁচল, ঠিক এ অবস্থায় কারুর পক্ষে তা দেখাও সম্ভব নয়। আমিও নৌকো থেকে ছিটকে প'ড়ে অথৈজলে এক চুবানি খেয়ে ভেসে উঠলাম। কোনদিকে কারুদিকে তাকাবার সময় নাই। সেই ভীষণাকার ক্রুদ্ধ আহত সাপটা বুঝি আবার তেড়ে আসছে! সাঁতরে গেলেই ধ'রে ফেলবে নিশ্চয়ই! পাগলের মত সাঁতরে ডুবিয়ে কিনারার দিকে ছুটলাম। নিজের জীবনকে যে মানুষ কত ভালবাসে ঠিক চরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত না হ'লে তা বুঝবার উপায় নেই।

কিনারা লক্ষ্য ক'রে তীরবেগে ছুটেছি। এইটুকু ত মাত্র সাঁতরেছি, কিন্তু এরই ভেতর যেন হাত দু'খানা অবশ হ'য়ে পড়েছে। ঐ যে অস্পষ্ট আলোকে কিনারা দেখা যাচ্ছে, প্রায় এসে প'ড়েছি তাহ'লে!

আতঙ্কে আরও জোরে সাঁতরাতে লাগলাম, এই সময়ে অস্পষ্ট আলো—আঁধারে দেখলাম, বাঁ দিক থেকে কি একটা জানোয়ার যেন আমাকেই লক্ষ্য ক'রে জলের উপর দিয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে।

কুমীর নয় ত ? আমার মাত্র কয়েক হাত পেছনে আবার জল তোলপাড়ের শব্দ শুনতে পেলাম, যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই পাইথনাকৃতি সেই সাপটা। আহত হ'য়ে তাড়া ক'রেছে, আমায় ধ'রে ফেল্‌ল ব'লে !

ঐ ত কিনারা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আর আমি যেন এগোতে পারছি না, হিংস্র নিশ্বাস দিয়ে যেন সাপটা আমায় পেছু টেনে নিচ্ছে। হঠাৎ পেছন থেকে "কুমীর কুমীর" ব'লে ভাঙ্গাগলায় কে চীৎকার করে উঠল। এ কি ? এ যে গার্ণারের গলার স্বর। আমার পেছনে যে জল তোড়পাড়ের শব্দ শুনছিলাম, তা সেই সাপটার নয়, গার্ণারের !

এদিকে বাঁ দিক থেকে কুমীরটাও প্রায় দশহাত ব্যাবধানে এসে পড়েছে। এ ভীষণ মুহূর্ত্তে কি করব, কিছু আর বুঝতে না পেরে টুপ ক'রে ডুব মেরে একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশে গিয়ে কিনারার মাটী পেয়ে লাফিয়ে গিয়ে কূলে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাত মাত্র পেছনে জলের ভেতর শুনতে পেলাম একটা ঝট্‌পটানীর শব্দ, আর সেই সঙ্গে গার্ণারের আর্ত্তস্বর।

কিন্তু এক মুহূর্ত্ত মাত্র। তারপরই সব নীরব নিস্তব্ধ। কেবল পাশে মূর্ত্তিমান অন্ধকারের অনন্ত বিরাটরূপ ধরে দাঁড়িয়ে নিবিড় জঙ্গল, আর তারই নীচে হিংস্র প্রাণী পরিপূর্ণ নদীর ক্রুদ্ধ হুঙ্কার। অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায়, তাকিয়ে দেখলাম যদি সঙ্গীদের ভেতর এখনও কেউ বেঁচে থাকে, যদি কাউকে দেখতে পাই যে সাঁতরে আসছে ! কিন্তু কই কাউকেই ত দেখি না।

তবে কি আমিই একমাত্র দলের ভেতর বেঁচে আছি? আর একটুক্ষণ আগে আমার যে আর পাঁচজন সঙ্গী ছিলেন, তাঁদের ভেতর আর কেউই বেঁচে নাই? তবে আমার বেঁচে লাভ? আমিও তাহ'লে নদীর ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ি! কিন্তু, না,— কাপুরুষের মত মরণের কাছে আত্মসমর্পণ করব না। একেবারে কিনারায় তখন আমি দাঁড়িয়ে। জল থেকে পা তুলে সবে তীরে ডান পা'খানা বাড়িয়েছি, অমনি ভুস্ ক'রে বালি ও পাঁকের ভেতর পা'খানা হাটু পর্য্যন্ত ডুবে গেল।

বাঁ পা'খানা যেই তুলতে যাই, অমনি ডান পা'খানা আরও ডুবতে থাকে। অসহায়ের মত চারিদিকে একবার তাকিয়ে জঙ্গলের দিকে দৃষ্টি ফেলতেই একজোড়া জ্বলন্ত আলোর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হ'ল। মনে হল: যেন ছোট আলো দুটো এদিকেই এগিয়ে আসছে।

সেই পিউমাটা নয় ত? নৌকোর উপর থেকে তার মেঘ-গর্জ্জন শুনেছিলাম, তার চোখ দুটো এই ভাবেই জ্বলতে দেখেছিলাম। সেই তাহ'লে ধেয়ে আসছে। মৃত্যু যখন তার করাল ছায়া বিস্তার ক'রে অসহায় শিকারকে নিষ্ঠুর মরণের জালে জড়িয়ে ফেলে, তখন কি এমনি ভাবেই সে হতভাগ্যকে চারিদি'ক থেকে একেবারে সম্পূর্ণ অসহায় ক'রে, তার আত্মরক্ষার সমস্ত শক্তিটুকু কেড়ে নিয়ে তিলে তিলে পলে পলে নিঃশেষ ক'রে মারে?

রাইফলটার কথা মনে হ'ল, কিন্তু আত্মরক্ষার বৃথা আশা!

নদীর ঘূর্ণীপাকে ঘুরতে ঘুরতে কোন্ অতল তলে সেটা নৌকোর সঙ্গেই চ'লে গিয়েছে।

অদূরস্থ ঝোপের ভেতর জোনাকীর আলোর মত আলো ছুটো ঐ যে জ্বলছে, এবার চাপা গর্জ্জনও শুনতে পাচ্ছি। সেই পিউমাটাই বটে! কিন্তু এভাবে শেষটায় পিউমার হাতে জীবন দেবো! আলো যে নীচু হয়ে গেল, লাফিয়ে এসে পড়বে তাহ'লে এবার!

অসহায় দৃষ্টি মেলে আর একবার নদীর দিকে তাকালাম। পাৎলা অন্ধকারে মনে হ'ল কে যেন সাঁতরে আসছে। আমার সঙ্গীদের ভেতর কেউ নয় ত? মানুষ যখন অথই জলে হাবুডুবু খায়, তখন একগাছি খড়ও সামনে দিয়ে ভেসে গেলে সেইটা ধ'রেই বাঁচতে চেষ্টা করে। তখন সে ভুলে যায়, যে তার হাতের একটা আঙ্গুলের ভারও ব'য়ে নেওয়ার সাধ্য সে খড়গাছির নাই। ভরসা ক'রে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলাম, আমার সঙ্গীদের ভেতর কেউ নয়,—ধেয়ে আসছে আমারই মৃত্যুদূত ;—একটা প্রকাণ্ড কুমীর 'হা' করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

ছুখানা পা'ই এবার বালির ভেতর ডুবতে আরম্ভ ক'রেছে। এক চুল ওদিকে এদিকে নড়ে কার সাধ্য। হাত ছুখানা ছ'পাশে শিথিল হ'য়ে পড়ে গেল। শেষবারের জন্যে ভগবানকে একবার ব'লতে ইচ্ছে হ'ল,—'হে ভগবান! জন্মেছি যখন মৃত্যু হবেই। মরতে একটুও ভয় পাই না। বিশেষতঃ মরণকে বরণ করতে হবে, এ জেনে শুনেই ত এ নদীতে নৌকো ভাসিয়েছিলাম।

কিন্তু এ ভাবে—এমনি ভাবে একেবারে হাত পা বেঁধে আমাদের মারলে! জানি না—এ কি তোমার কঠিন বিচার!'

সুমুখ পেছন, দু'দিক থেকে মরণ ধেয়ে আসছে। জল জঙ্গল দু'দিকেই মৃত্যুদূত। মৃত্যুর হিংস্র নিঃশ্বাস আমার গায়ে এসে লাগছে। এই তা হ'লে শেষ।

কুমীরটাও পাঁচ হাতের মধ্যে এসে পড়েছে, পিউমাটাও একেবারে সামনে। উঃ, কি ভয়ঙ্কর! আমার চোখ দুটো বুজে এল।

থপাস্ ক'রে জলমাখা বালুর উপর ব'সে পড়লাম, আর সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট হুঙ্কার ছেড়ে পিউমাটা দিলে আমার উপর লাফ।

কিন্তু এ কি! লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'য়ে আমার মাথার উপর দিয়ে গিয়ে জলে পড়ল না কি? আরে বাপ্ রে বাপ্! এ যে ভীষণ লড়াই!—পিউমাটা আমার গায়ে এসে পড়তে গিয়ে একেবারে কুমীরটার ওপরে গিয়ে প'ড়েছে। হাটু জলের ভেতর,—আমার কাছ থেকে মাত্র তিন হাত তফাতে তুমুল যুদ্ধ চলছে! এ কি ব্যাপার?

এক মুহূর্ত্ত দেখেই বুঝলাম্, এ যে-সে লড়াই নয়। আমারই মত ওদের জীবন মরণের সন্ধিস্থল এটা। একজন চায় ডাঙ্গায় তুলতে,—আর একজনে চায় গভীর জলে টেনে নিয়ে যেতে। চীৎকারে, জলের শব্দে, নদী একেবারে তোলপাড় করে ফেলছে।

একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখছি, হঠাৎ

মনের অন্তঃস্থল থেকে কে যেন আমায় একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে বল্‌ল, 'আমাজনের যাত্রী তুমি, 'হা' ক'রে দেখছ কি? এরাই ত তোমাদের পথের বন্ধু। সর্ব্বক্ষণই এরা চাইবে তোমাদের হাড়মজ্জামাংস। পালাও মুশাফীর, পালাও! তোমার পূর্ব্বে এই পথে যারা পা বাড়িয়েছিল, তারাও কিন্তু আর ফিরে যায় নাই, কেন যেতে পারে নাই, তা বুঝছ? দেখছ ত?'

মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। মরব, কিন্তু কাপুরুষের মত নয়। শরীরে নতুন বল সঞ্চার ক'রে হাতের উপর ভর দিয়ে অতিকষ্টে পা দু'খানা তুলে চতুষ্পদ জন্তুর মত চার হাতে পায়ে ভর দিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চললাম। এ ভাবে প্রায় ত্রিশহাত গিয়ে গাছের পাতা হাতে ঠেক্‌ল। পাঁকের ওপর গাছের পাতা পুরু হ'য়ে প'ড়ে—পচে একটা দামের সৃষ্টি করেছে। এখানটায় আর পা ব'সে যায় না। খাড়া হ'য়ে দাঁড়ালাম। জঙ্গল এখান থেকেই সুরু।

পেছনে জল তোলপাড় ও গর্জ্জন সমান ভাবে চলছে। আশ্চর্য্য! জলের ভেতর কুমীরের সঙ্গে পিউমাটা এখনও ল'ড়ছে। শেষ পর্য্যন্ত একজন জিতবেই—তখন নতুন ক'রে আবার বিপদ দেখা দিতে পারে। দিতে পারে কেন, দেবেই। কারণ ওদের লড়াইয়ে ত আর সন্ধি নেই, বা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়নও নেই। একজনকে অপরের কাছে শেষ পর্য্যন্ত জীবন দিতে হবেই।

এই জঙ্গলের ভেতরই উপস্থিত আশ্রয় নিতে হবে, তারপর

বরাতে যা আছে, তাই-ই হবে। নদীর ওপর অন্ধকারের ভেতর একটু আবছা আলোর রেখা দেখা গেলেও, জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আমার চক্ষুস্থির হ'য়ে গেল! চোখ দুটোর পাতা সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে তার ভেতরে ঢোকাও যা, চোখ চেয়ে ঢোকাও তাই।

অন্ধকার যে এত গাঢ় এত মিশমিশে হ'তে পারে, এ ধারণারও বাইরে ছিল। সঙ্গে টর্চ্চ, দিয়াশলাই যা কিছু ছিল, কোথায় যে তা চলে গিয়েছে, তা জানে ঐ রাক্ষসী নদী।

কিন্তু আর একটী মুহূর্ত্তও ত অপেক্ষা করা চলে না। পিউ-মাটার গোঙানি শোনা যাচ্ছে এবার। সেও তাহ'লে আমার সঙ্গীদের পথে চ'লল। বিশ্বাস নেই এ অঞ্চলের কুমীরদের! এরা সব পারে। হয়ত ডাঙ্গা থেকেই হিড় হিড় ক'রে টেনে জলে নামাবে।

কিন্তু এ কি! প্রথমেই যে কাঁটাঝোপ আর লতাপাতায় আমার পথরোধ করল। কাঁটার ঘা'য়ে কপাল থেকে রক্ত পড়ছে নাকি? উঃ, কি ভীষণ,—যেন জঙ্গলের দুর্গদ্বারের সশস্ত্র প্রহরী এরা।

এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে কাঁটাঝোপ ঠেলে পথ তৈরী আর এক পাও যে এগোন অসম্ভব! তাহ'লে? উপায়?.........

কিন্তু আমি যে দুর্গম পথের যাত্রী। পথ ত আর কেউ আমার জন্যে আগে থেকে এসে তৈরী ক'রে যায় নি। পথ আমার—আমাকেই তৈরী ক'রে নিতে হবে। মুহূর্ত্তে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ে সাপের মত এঁকে বেঁকে বুকে হেটে শুক্‌নো পাতা আর লতার কাঁটা সরিয়ে এগোতে লাগলাম।

— ছয় —

উঃ, কি ভয়ঙ্কর! হাজারে হাজারে লাখে লাখে মশা এসে ছেয়ে ধ'রেছে। সমস্ত শরীর ঢাকা থাকলেও মুখ গলা ও ঘাড়ের পাশ দিয়ে এরই ভেতর যেন ক্ষত-বিক্ষত ক'রে ফেলেছে।

কত যুগ ধরে যেন গাছের পাতা আর ডালপালা মাটীতে প'ড়ে প'ড়ে জমা হয়ে আছে। তার ওপর আবার বর্ষায় বন্যার জল সম্ভবতঃ কিছুদিন স্থির হয়ে থেকে আরও ভীষণতার সৃষ্টি ক'রেছে। শুকনো পাতার আবরণের নীচেয় আটার মত কাদা। হাত পা যেন টেনে ধরছে।

জঙ্গলের ভেতর সাপের মত এগিয়েই চ'লেছি। মশকের গুঞ্জন, নাম-না-জানা পাখীর ডাক, আশে পাশে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে অদূরে পাতার খস্ খস্ শব্দ কাণে আস্ছে। পাতার শব্দে মনে হয়, কোন ছোটখাটো জানোয়ার চলাফেরা করছে।

কিছুদূরে একটা জাগুয়ারের পর পর কয়েকটা ডাক কাণে এল। বোধ হয় তিনশ' হাত দূরেও নয়।

গভীরতম জঙ্গলে এসে পড়েছি। আর মাটীতে থাকা নিরাপদ নয়—এবার গাছে উঠতে হবে। গাছেই রাতটা কাটিয়ে দেবো।

উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধের মত চোখ চেয়ে গাছ হাতড়াতে

লাগলাম। এ কি? সাপ?—দু'হাত পিছনে লাফিয়ে পড়লাম। কিন্তু তখুনি আমার মনে পড়ল, এ জঙ্গলে মোটা মোটা লতাগুলো বিরাটকায় লম্বা সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝুলতে তখন নৌকো থেকে দেখেছিলাম। এ নিশ্চয়ই হয়ত সেই সর্পাকৃতি লতা!

এক পা এগোলাম, হাত বাড়ালাম!—কিন্তু যদি সত্যিই সাপ হয়? এ জঙ্গলে সাপের আর অভাব কি! সাপের হাতে পড়েই ত আমাদের এই পরিণাম! হতভাগ্য সঙ্গীদের কথা মনে পড়ল, দু-চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা ছুটলো। তারা কেউই আর বেঁচে নাই, আমি এখনও মরণের সাথে লড়াই করছি। আমি বেঁচে আছি।

কিন্তু না, আর চিন্তা করতে পারি না। সাপ হোক্, আর লতাই হোক্, আমি ওই আঁকড়ে ধরব। দু'হাত বাড়িয়ে ধরলাম। সত্যিই—লতাই বটে—সাপ নয়।

মোটা লতাটা নিশ্চয়ই পেচিয়ে পেচিয়ে গাছের ডাল থেকে নেমে এসেছে। আমি তাহ'লে এই লতা বেয়েই গাছের ডালে উঠতে পারব।

দুই হাতের উপর শরীরের সম্পূর্ণ ওজন রেখে ঝুলে ঝুলে উঠতে লাগলাম। কিন্তু যে ডাল থেকে শিকড়টা নেমেছে, সেটা কত উচুতে যেন! অন্ধকারে কিছু কি আর বুঝবার যো আছে!

একটা পাখী বোধ হয় হিংস্রই হবে, এই গাছেরই মগডাল থেকে ভীষণ চীৎকার করে উঠল। পাখীর ডাকও যে এত

নিষ্করুণ, কর্কশ ও হিংস্র ভাব মাখান হতে পারে, তা ধারণার বাইরে ছিল। ধারণার বাইরে, অবশ্য এখানকার অনেক কিছুই ছিল।

এবার ডাল পেয়েছি, শিকড়টা এখান থেকেই নেমেছে বটে। কিন্তু এ কি! এত পিছল কেন। এত ওপরে গাছের মোটা ডালে এত পিচ্ছলতা। সম্ভবতঃ আলো বাতাসের অভাব আর বৃষ্টির জন্যেই এরূপ অবস্থা।

খুব সাবধানে অতি কষ্টে ঘোড়ায়-চড়া মত করে মোটা ডালটার দুদিকে পা জড়িয়ে বসলাম। এদিক ওদিক সরতে গিয়ে হয়ত পা হড়কে হুড়মুড় করে নীচের কাঁটা ঝোপের উপর পড়তে হবে, আর এত অন্ধকারে করাই বা যাবে কি? রাতটা এভাবেই কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

স্থির হয়ে না বসতেই প্রথমেই মনে পড়ল, হতভাগ্য সঙ্গীদের কথা। গার্ণারকে ত চোখের উপর কুমীরে টেনে নিয়ে গেল। অন্যান্য সঙ্গীরা ত চিরদিনের জন্য চলে গেছে! তারা সাপের মুখে, না, নদীর অতল জলরাশির ভেতর সলিল সমাধি নিয়েছে, একমাত্র জগদীশ্বর তা জানেন। আর আমি?—আমি এখনও এই মৃত্যুসঙ্কুল পারিপার্শ্বিকের ভেতর মরণ যন্ত্রণা ভোগ করছি।

উঃ অসহ্য! হাজারে হাজারে রক্ত-লোলুপ মশামাছি এসে ঘিরে ফেলেছে। সমস্ত শরীর জামায় ঢাকা। মুখখানা আর গলা ও ঘাড়ের পাশে যেন অসংখ্য মৌমাছি এসে দংশন করছে।

মনে হ'চ্ছে যেন কপাল ও গাল থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। সমস্ত শরীরে যেন ক্রমাগত কে উগ্রবিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু এ ভাবে এদের ভীষণ আক্রমণ থেকে নিজেকে কতক্ষণ জীবন্ত রাখতে পারব। প্যাণ্টের পকেটে একখানা বড় রুমাল ছিল। সেইখানা তাড়াতাড়ি বার ক'রে, দুহাতে নেড়ে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করতে লাগলাম!

কিন্তু এ ভাবে রাতটা কি কাটিয়ে দিতে পারব? ওঃ, একটা মিনিটও যেন অসহ্য বলে মনে হ'চ্ছে, আর সমস্ত রাত?··· কিন্তু উপায়?

কি যেন একটা আশপাশ দিয়ে ঘুর্ ঘুর্ করে বেড়াচ্ছে। কাঠবেড়ালী কিংবা ঐ শ্রেণীর কোন প্রাণী হবে। মাঝে মাঝে উচু ডালে বানরের 'হুক' শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারা বোধ হয় টেরই পায়নি যে এক অজানা অতিথি তাদের গাছে আজ রাত্রের মত আশ্রয় নিয়েছে।

কিসের একটা চাঁপা ক্রুদ্ধ গর্জ্জন কাণে এল। সম্ভবতঃ গাছের নীচে থেকেই। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, জমাট-বাঁধা অন্ধকারের ভেতর সবুজ রং মাখান দুটো আলো,—ঠিক পাশাপাশি। নিশ্চয়ই এ কোন হিংস্র জন্তু, আমায় দেখতে পেয়ে এ ভাবে গর্জ্জন করছে! সেই পিউমাটার চোখ দুটোও প্রায় এই রকমই জ্বলতে দেখেছিলাম।

জানোয়ারটার দুটো চোখের মণি থেকে আলো যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে, আর সে যে আমারই দিকে স্থির দৃষ্টিতে মুখ উঁচু করে

তাকিয়ে আছে, তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি। কি ভীষণ জানোয়ার! এই গাঢ় অন্ধকারেও আমার অস্তিত্ব এখানে টের পেয়েছে। চোখের জ্বলন্ত আলো ফেলে জঙ্গলের সর্ব্বত্র শিকার সন্ধানে এরা বোধ হয় অন্ধকারেও এমনিভাবে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু কি জানোয়ার ওটা?

আমার মনের কথা বুঝতে পেরে যেন আমায় পরিচয় দেওয়ার জন্যেই জানোয়ারটা ভীষণ গর্জ্জন করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা উত্তরদিকে স'রে গেল।

সর্ব্বনাশ!—এ যে জাগুয়ার।

নিরস্ত্র আমি,—এখন উপায়?—ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যে সম্পূর্ণ অসম্ভব। গাছের একেবারে মগডালে গিয়ে উঠলেও ত আমায় রেহাই দেবে না। আর এই ঘোর অন্ধকারে ডালপালা কিছুই ত দেখতে পাচ্ছি না। এখন কি করব?······ এতক্ষণ যা হোক্ এক রকম কাটিয়েছি, কিন্তু এবার?

কিন্তু জাগুয়ারটা ওদিকে স'রে গেল কেন? সর্ব্বনাশ! আলো দুটো যে ওপরদিকে উঠে আস্‌ছে। জানোয়ারটা তা'হলে গাছ বেয়ে আমায় আক্রমণ করতে আসছে! যাক্, এবার তা'হলে আমায়ও সঙ্গীদের পথে যাত্রা করতে হ'ল। সমস্ত শরীরটার ভেতর যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, মানুষ যখন অথই জলে ডুবতে থাকে, তখন একগাছি খড়ও সাম্‌নে দিয়ে ভেসে যেতে দেখলে সেইটে আঁকড়ে ধ'রে বাঁচতে চায়। এটা মানুষের স্বভাব।

চট্ করে আমার মনে প'ড়ে গেল, আমার পিঠে ঝুলান ছোট ক্যাম্বিশের ব্যাগটার ভেতর একখানা ঝক্‌ঝকে ছোরা আছে। ঝাঁ করে সেখানা টেনে বার করলাম, তারপর দৃঢ়ভাবে ছোরাখানা ডানহাতে ধরে প্রস্তুত হ'য়ে বসলাম।

একখানা ছোরামাত্র হাতে নিয়ে গাছের ডালের ওপর ব'সে হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করা কি সম্ভব ? কিন্তু তাই ব'লে তার কবলে গা এলিয়ে দিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করব কেন ? যতক্ষণ জীবন আছে, বাঁচতে চেষ্টা করতে হবে ততক্ষণ।

ঐ যে জানোয়ারটা এবার এদিকেই এগিয়ে আসছে। ভয়ঙ্কর চোখ দুটোয় যেন প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলে অন্ধকারে পথ দেখে দেখে আসছে। এরাই ত এই মৃত্যু-সঙ্কুল জঙ্গলের সর্ব্বময় কর্ত্তা। অপরের অনধিকার ওদের এলাকায় ওরা বরদাস্ত করবে কেন ?

হাতের দৃঢ়মুষ্টির ভেতর ছোরাখানা একবার কেঁপে উঠল। সমস্ত শরীরের শিরা উপশিরার ভেতর দিয়ে যেন একটা প্রবল রক্তের স্রোত ব'য়ে গেল। মৃত্যুপুরীর এ আর এক নতুন দূত আসছে শমনের হুকুম বহন ক'রে !

এবার জাগুয়ারটা, গাছের যে ডালটায় আমি বসে আছি,—সেইটের উপর দিয়েই নিঃশব্দে গুড়ী মেরে মেরে—কুঁজো হয়ে এগোচ্ছে। যেন তার মতলব বা তার অস্তিত্ব আমি টেরই পাই নি ! এবার খুব কাছে এসে পড়েছে, হয়ত এখুনি লাফ দেবে—ব'সে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

হাতের দৃঢ়মুষ্টির ভেতর ছোরাখানা একবার কেঁপে উঠল · ···(পৃঃ ৩২)

ছোরাখানা উঁচু করে বাগিয়ে ধরলাম। সূচীভেদ্য মিশমিশে অন্ধকারে ওর জ্বলন্ত চোখ দুটো ছাড়া শরীরের কোন অংশই আর দেখতে পাইনি। তারপর এক মুহূর্ত্ত,—তারপরই বিকট গর্জ্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগুয়ারটা দিলে আমার উপর লাফ।

ছোরাখানার মুখ উঁচুদিকে ধরা ছিল, স্যাঁৎ ক'রে মাথা ও শরীর একসঙ্গে নীচু ক'রেই ছোরাখানা দিয়ে এত জোরে ঘা মারলাম যে জাগুয়ারটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে আমার শরীরের উপর দিয়ে লাফিয়ে পিছনদিকে গিয়ে পড়ল এবং ছোরার প্রবল আঘাত সহ্য করতে না পেরে ডালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে হুড়মুড় ক'রে নীচেয় পড়ল। যেন গাছটার একখানা ডাল ভেঙ্গে মাটীতে প'ড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে কি আকাশ ফাটা গর্জ্জন! কিন্তু আশ্চর্য্য! একটা নখের আঁচড় পর্য্যন্ত আমার গায়ে লাগল না।

তীক্ষ্ণধার ছোরাখানা জাগুয়ারটার পেটে প্রায় আমূল-বিদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে, মনে হচ্ছে। ছোরা পেটে বেঁধা অবস্থায়ই জাগুয়ারটা গাছ থেকে পড়ে গেছে। পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় চীৎকারে সমস্ত জঙ্গল যেন মাথায় ক'রে তুলেছে! এবারও কি তাহ'লে রেহাই পেলাম? মৃত্যুর করালছায়া এবারও কি আমার মাথার ওপর থেকে স'রে গেল? কিন্তু শেষ সম্বল ছোরাখানা,— সেখানাও যে হাতছাড়া হ'য়ে গেল! এখন যদি নতুন ক'রে আবার বিপদ দেখা দেয়, তখন উপায়?

ও কি ?—সর্ব্বনাশ !—জাগুয়ারটা যে গর্জ্জন করতে করতে আবার গাছের উপর উঠে আসছে ! তর্ তর্ ক'রে গাছ বেয়ে উঠ্‌ছে দেখি ! এখন উপায় ?

আহত জাগুয়ার সিংহের চেয়েও ভীষণ হয় শুনেছি, এ ত তা'হ'লে এখুনি আমায় টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলে দেবে ! আর জলে-জঙ্গলে যেখানে পদে পদে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি, যেখানে হিংস্র দৃষ্টি মেলে প্রতি মুহূর্ত্ত তাকিয়ে আছে মৃত্যুদূত, সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরার আশাও আমার পক্ষে বাতুলতা নয় কি ?

একটু আগে একখানা ছোরা, আমার আত্মরক্ষার শেষ অস্ত্র, সে সম্বলটুকুও হাতছাড়া হ'য়ে গেছে। এবার আমি মুক্ত, একেবারে মুক্ত, স্বাধীন। আমাজনের যাত্রী আমি, আমায় অধীর হ'লে চল্‌বে কেন ?—কত বন্ধু আমাদের এর আগে এই বন্ধুর পথে পা বাড়িয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। আজ সন্ধ্যায় ছিলাম আমরা ছয়জন, আছি মাত্র আমি একা। এখনও আছি, আমার অস্তিত্ব এখনও আমি অনুভব করছি, কিন্তু ঐ যে ক্রুদ্ধ আহত জাগুয়ারটা ধেয়ে আসছে ভীষণভাবে আমার পানে গর্জ্জন করতে করতে,—ওর নিষ্ঠুর নিষ্করুণ আক্রমণে আর এক মুহূর্ত্ত বাদে থাকব

না। এখানে দয়া নেই, মায়া নেই, অনুকম্পা নেই। আছে শুধু একমাত্র বিশ্বগ্রাসী হিংসার যূপকাঠ। যেন নিরীহ ছাগ আর অসুর প্রকৃতি দুর্দ্ধর্ষ খাঁড়াতে সম্বন্ধ।

• কিন্তু চিন্তার আর সময় নাই,—ঐ যে এসে পড়ল।

ছায়াছবির মত চোখের উপর ভেসে উঠল, সেই পাইথন-আকৃতি অতিকায় ভয়ঙ্কর সাপটার উটের মত মুখ, আর আমাদের যাত্রীদলটীর শেষ মুহূর্ত্তের সমবেত ভয়ার্ত্ত চীৎকার। তারা যেন কোথা থেকে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ভয়-ভাবনা মন থেকে সরে গেল। নির্ব্বিকারের মত ডালটার উপর লম্বালম্বি হয়ে সটান শুয়ে পড়লাম। ডাইনে বাঁয়ে অন্ধকারপুরীর অসীম শূন্যতা। যে কোনদিকে পাশ ফিরলেই অন্ততঃ পঁচিশহাত নীচেয় কাঁটাঝোপের উপর অথবা শুকনো ডালপালার উপর অসহায়ের মত পড়তে হবে।

কিন্তু তার আর আবশ্যক নাই, ঐ যে আহত জাগুয়ারটা এসে পড়েছে। কিন্তু আমি এ কি করছি? আমি শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছি!—না,—তা হয় না। হ'লামই বা অস্ত্রহীন, তাই ব'লে.........

চিৎ হয়ে শুয়ে—ডালটাকে পিঠের দিক থেকে দুই হাতে বেশ জোর ক'রে আঁকড়ে ধরলাম, তারপর পা দুখানা একত্র ক'রে শূন্যে তুললাম। কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমার শরীরে শক্তির প্রবাহ ঢেলে দিল। আমার মাথার চুল খাড়া হ'য়ে উঠলো, আমি একটী আসন্ন অতি-ভীষণ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায়

নিশ্বাস বন্ধ করলাম। তারপর—তারপরই আমার পায়ের কাছ থেকে মাত্র পাঁচহাত দূরে জাগুয়ারটা হঠাৎ নীচু হ'য়েই মেঘগর্জ্জন করে—দিল আমায় লক্ষ্য করে লাফ।

প্রস্তুত হ'য়েই ছিলাম। জীবন-মৃত্যুর এ সন্ধিক্ষণে মানুষ কিছুমাত্র কার্পণ্য করে না তার শরীরের সমস্ত শক্তিটুকু নিঃশেষে ব্যয় করতে। জোড়া পায়ের লাথি—বিশেষতঃ এ সময়ে, জাগুয়ারটা হজম ক'রে উঠতে পারল না। দুখানা সবুট পায়ে এত জোরে প্রকাণ্ড এক লাথি ছুঁড়লাম যে এবারও জাগুয়ারটাকে বিফল হ'য়ে ছিটকে গাছপালার উপর দিয়ে মাটীতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়তে হ'ল। কিন্তু তার নখের আঁচড়ে আমার হাঁটুর কাছ থেকে খানিকটা ছিঁড়ে গেল।

আশ্চর্য্য! এবারও তাহ'লে অদ্ভুত উপায়ে ওর আক্রমণ প্রতিরোধ করলাম,—কিন্তু আবার যদি আসে, আবার—আবারও?

কিন্তু সে ভাবনা এখন নয়। ভাবতে গেলে সে ভাবনার শেষে পৌঁছুতে পারব না। ভাবনার মাঝে খেই হারিয়ে যাওয়া দূরের কথা, গোড়াকার সূত্র ধরতেই পারব না।

জাগুয়ারটার গর্জ্জন সমান ভাবেই চল্‌ছে, কিন্তু এবার গর্জ্জনে আর সে হুঙ্কার নাই,—শেষটায় যেন কতকটা গোঁঙানির মত। ছোরার আঘাতে নিশ্চয়ই গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে।

নীচের ঝোপঝাড় লতাপাতা সব যেন কে ভেঙ্গেচুরে ছিঁড়ে পিশছে। উন্মত্ত আহত জাগুয়ারটা মরণ যন্ত্রণায় সম্ভবতঃ ছট্‌ফট্

করছে। আবার গাছ বেয়ে আক্রমণ করতে আসবে না ত?

এক মিনিট দুই মিনিট করে ক্রমে দশ মিনিট কেটে গেল। জাগুয়ারটার এবার একটানা করুণ আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছে। চারিদিকে সব নীরব নিস্তব্ধ। যেন, যে যেখানে ছিল, সব ভয়ে পালিয়েছে। ক্রোধোন্মত্ত জাগুয়ারকে হয়ত তারা যমের মত ভয় করে।

আরও কয়েক মুহূর্ত্ত পরে জাগুয়ারটা হঠাৎ চুপ করে গেল। বোধ হয় তার গর্জ্জন চিরদিনের জন্য থেমে গেল।

এদিকে অসংখ্য বিষধর পোকা ও মশার কামড়ে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। সর্ব্বাঙ্গে যেন কে উগ্র নাইট্রিক এসিড্ ঢেলে দিয়েছে। আর এভাবে শুয়ে থাকা চলে না। এই রাত্রেই হয়ত এই পোকামাকড়ের হাতেই প্রাণ দিতে হবে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসতে গেছি, হঠাৎ একি?

জঙ্গল-ঢাকা অন্ধকার পুরীতে বাতাসের লেশমাত্র নাই,—ভয়ানক গরম লাগছিল, হঠাৎ এত ঠাণ্ডা, এত আরামদায়ক বাতাস কোথা থেকে আস্‌ছে? আঃ, কি আরাম, বিপদের বেড়াজালে আট্‌কা পড়েছি, প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন নিয়ে টানাটানি, তবুও ইচ্ছে হচ্ছে একটু চোখ বুজে ঘুমিয়ে নি। উঠতে আর ইচ্ছে করছে না। যেন নেশা লাগছে, চোখ টেনে চাইতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ঈশ্বর প্রেরিত কোন দেবদূত আমার দুর্দ্দশা দেখে দয়াপরবশ হ'য়ে ছুটে এসেছেন। আমার গা থেকে অসংখ্য

মশামাছি তিনি বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। পাখার বাতাস এর কাছে কোথায় লাগে!

সমস্ত চেতনা ধীরে ধীরে যেন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, ঢ'লে পড়ছি নিদ্রার কোলে, বাতাস এমন মধুর যে মনে হচ্ছে কতকাল,—কতকাল বাদ যেন বাতাসের অস্তিত্ব অনুভব করছি।—ঠিক এমনি সময়ে—আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কে যেন চীৎকার ক'রে বলল, "ওগো আমাজনের যাত্রী! তুমি কোথায়?"

মুহূর্ত্তে তন্দ্রা ছুটে গেল। তাইত, আমি কোথায়?

হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ দুর্গম জঙ্গলের এক গাছের ডালের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আমি আরামে নিদ্রা যাওয়ার উদ্যোগ করছি। চারিদিকে—ওপরে নীচেয় অসংখ্য রক্ত-লোলুপ জন্তু-জানোয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে কোন মুহূর্ত্তে জীবন যাওয়ার সম্ভাবনা। আর ঘুমের ঘোরে একটু কাৎ হলেই গভীর কাঁটা-ঝোপের উপর পঁচিশহাত নীচেয় হুম্‌ড়ী খেয়ে গিয়ে পড়তে হবে।

আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য, একটু আগে মরতে মরতে বেঁচে গেলাম, এই মুহূর্ত্তেই হয়ত অনুরূপ বিপদ আবার মূর্ত্তি নিয়ে দেখা দেবে,—তবুও আমি ঘুমুচ্ছি,—ঘুমোতে পারছি?

কিন্তু এ কি ঘুমের নেশা! চোখ ভাল ক'রে রগড়েছি, তবুও তাকাতে যে কষ্ট হচ্ছে। সমস্ত শরীর মশা ও পোকার কামড়ে যে 'রী' 'রী' ক'রে জ্বলছিল, তা পর্য্যন্ত মনে হচ্ছে, থেমে গেছে।

এত ঠাণ্ডা—এত মধুমাখা বাতাস এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর

সমস্ত চেতনা ধীরে ধীরে যেন লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে······(পৃঃ ৩৮)

কোথা থেকে আসছে ? ঝড় উঠেছে কি ?—কই, না—। ঝড় দূরের কথা,—'টুঁ' শব্দটীও যে কোথাও হচ্ছে না। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ। কেবল মশার একঘেঁয়ে মৃদু গুঞ্জন ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ডাক, আর মাঝে মাঝে নাম-না-জানা জন্তুজানোয়ারের গর্জ্জন কাণে আসছে।

চারিদিকে গাছের পাতাগুলো পর্য্যন্ত স্থির হয়ে আছে। তবে ? সন্দেহ হ'ল, ব্যাপার কি ? এ কি আবার নতুন রহস্য !

তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বস্‌লাম। সঙ্গে সঙ্গে, আমার মাথা থেকে মাত্র তিনহাত দূরে গাছের ডাল থেকে একটা পাখা ঝট্‌পটানোর আওয়াজ এল। অন্ধকারে দেখ্‌তে না পারলেও পরিষ্কার বুঝলাম, কোনো প্রকাণ্ড একটা পাখী, আমি উঠে বসতেই হয়ত ভয় পেয়ে উড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সুমধুর বাতাসও বন্ধ হ'য়ে গেল।

তাহ'লে কি এতক্ষণ ঐ পাখীটাই আমায় নিঃশব্দে ডানা নেড়ে বাতাস করছিল ? কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ? এ কি কোন নিশাচর রক্তপায়ী পাখী ? আমায় ঘুমে অচেতন ক'রে রেখে তারপর কাজ হাসিল করাই কি ওর উদ্দেশ্য ছিল ? উঃ, কি ভয়ানক ?

জলে ডাঙ্গায় শূন্যে,—কোথায়ও কি নিস্তার নেই ? হা ভগবান, এ কোন্ মৃত্যুপুরীতে এসে পড়েছি ?

গার্ণারের কথা মনে প'ড়ে গেল। আজ তাঁর কি দুর্দ্দশাই চোখের উপর দেখলাম। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই ত এই জলে-

জঙ্গলে পা বাড়িয়েছিলাম। এর আগে আর একবার রবার-গাছের সন্ধানে তিনি সদলবলে পেরুর জঙ্গলঘেরা নদীতে নৌকো ভাসিয়েছিলেন। তাঁর মুখে এই জঙ্গলগুলোর অনেক কথাই শুনেছিলাম। তখন সবটা বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম তিনি অতিরঞ্জিত ক'রে ব'লেছেন। কিন্তু আজ ?—

আজ মনে হচ্ছে, হয় আমাজনের জঙ্গল সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি চেপে গেছেন, না হয়, এত বড় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর লাভ করবার সুযোগ মোটেই ঘটেছিল না।

তাঁর মুখে শুনেছিলাম, এ জঙ্গলের অতিকায় রক্তচোষা বাদুড় 'ভ্যাম্পায়ার'এর কথা। এ পাখীটা কি তাহ'লে সেই ভ্যাম্পায়ার ?

গার্ণার যা বলেছিলেন, তার সঙ্গে ত সবই মিলে যাচ্ছে। গার্ণার বলেছিলেন, এই বাদুড়গুলো রক্তপায়ী এবং হিংস্র। টাটকা রক্ত খেয়েই এরা বেঁচে থাকে। এদের আক্রমণের রীতিও অদ্ভুত। প্রথমতঃ এরা ঘুমন্ত মানুষের কাছে উড়ে এসে পড়ে, তারপর হিংস্রতায় পরিপূর্ণ মুখখানা বাড়িয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুখানা পাখা দিয়ে নিঃশব্দে বাতাস করতে থাকে। এদের এই পাখার বাতাসে এমন একটা মাদকতা আছে এবং বাতাস এতই মধুর যে সহজেই গাঢ় ঘুম এসে শরীরকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। ওরা এই সুযোগটার অপেক্ষা করে। খুব আস্তে সূঁচের মত দাঁত কোন রক্তবাহী মূল শিরায় বসিয়ে দেয়, তারপরই 'চোঁ' 'চোঁ' ক'রে রক্ত টেনে খেতে থাকে। যেমন

মশা তীক্ষ্ণ হুল ফুটিয়ে রক্ত টেনে বার ক'রে নিলেও আমরা টের পাইনা, তেমনি ওরা এমন অদ্ভুত কৌশলে রক্ত খেতে থাকে যে ঘুমন্ত মানুষ মোটেই টের পায় না।

যখন মানুষের টের পাওয়ার মত অবস্থা হয়, তখন শরীরের সমস্ত রক্তটুকু প্রায় নিঃশেষ হ'য়ে গেছে।

গার্ণার বলেছিলেন, এই অতিকায় বাদুড়গুলো বহু মূল্যবান জীবন নষ্ট করেছে। এই সব জঙ্গলে এদের অত্যাচার নেহাৎ কম নয়।

রাত ক'টা হ'ল কিছুই বুঝবার উপায় নেই। গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে আজকের রাতটা যদি কোনমতে কাটিয়ে দিতে পারি, তবে সকালে যা হয় একটা ব্যবস্থা করবই।

কিন্তু কি ব্যবস্থাই বা করব! এ জঙ্গলে ত দিন আর রাত্রি দুই-ই সমান। এই সব হিংস্র জন্তুর যে সব সময়েই এখানে একচেটিয়া রাজত্ব। পথের অভিজ্ঞতা নেই, সঙ্গে খাদ্য নেই, আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই, তবুও যেন আমার আশা হচ্ছে, রাত পোহালেই একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু জঙ্গলের অন্ধকারে কাঁটাঝোপ আর গাছপালা ঠেলে বা নদীর কিনারা ধ'রে ফিরে যাওয়া বা বিপরীত স্রোতে কোন কিছু অবলম্বন ক'রে ফিরে যাওয়া—কোনটাই ত সম্ভব দেখছি না।

কাল সকালের ভাবনা, না হয় কাল সকালেই, কিন্তু আজকের বাকী রাতটা ভালয় ভালয় কাটবে ত? মাত্র আজকের রাতটার জন্যেও বেঁচে থাকাটা যে এক বিষম ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

— আট —

মৃত্যুপুরীর অন্ধকার কারাগারে ফাঁসির আসামীর মত প্রতিটি মুহূর্ত্ত গুণছি, কখন এ রাত্রি পোহাবে? ওঃ, এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলের কালরাত্রি কি আর পোহাবে না? গাঢ় কালিমার অনন্ত রূপধারী এ অন্ধকারের দিকে কতক্ষণ চোখ চেয়ে তাকিয়ে থাকা যায়? আর কেবলই নাম-না-জানা হিংস্র জন্তুর ডাক আর শুক্‌নো পাতার উপর দিয়ে তাদের চলাফেরা করার শব্দ কতক্ষণই বা ধীরভাবে কাণ পেতে শুনা যায়?

কিন্তু উপায়?

গাছের ডাল বেয়ে কি একটা পোকা তখন যে বাঁহাতের আঙ্গুলটায় এসে কামড়ে দিয়েছিল, সে অসহ্য যন্ত্রণা এখনও যায়নি। যেন একটা আল্‌পীন কেউ আগুনে তাতিয়ে আমার আঙ্গুলটার ভিতর জোর ক'রে ঢুকিয়ে দিয়েছে। হাতখানা যেন অবশ হ'য়ে আছে।

ছোট বড় পাখীগুলো চারিদিক থেকে খুব ডাকতে আরম্ভ করেছে। বোধ হয় রাত্রি আর নাই। পূবদিকে নদীর কিনারায় জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে একটু আবছা আবছা ময়লা আলো দেখা যাচ্ছে। ভোর হয়ে গেল না কি?

গাছের মাথার উপর থেকে একটা বাজপাখী ডেকে উঠল। সমস্ত জঙ্গলের অন্ধ্রেরন্ধ্রে তার গগণভেদী ভয়ঙ্কর চীৎকার ঘা

খেয়ে খেয়ে নিশাশেষ ঘোষণা করে দিল। সে ডাক শুনলেই যেন বুকের ভেতর তুরু তুরু ক'রে ওঠে।

কতকগুলো বানর 'হুক্' 'হুক্' শব্দ করে ঝুপঝুপ করে এডালে ওডালে পালাতে লাগল। সম্ভবতঃ বাজপাখীর ভয়ে। গার্ণারের মুখে শুনেছিলাম, এই বাজগুলো প্রয়োজন হলে দুই একটা মানুষ নিয়ে সচ্ছন্দে উড়ে যেতে পারে। গাছ থেকে বানরগুলোকে বাগে পেলেই ছোঁ মেরে নিয়ে পালায়।

রাত তো পোহাল! এখন কি করব? কোন্ পথে যাব?

ক্ষুধায় যতটা না হোক, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। গাছ থেকে নেমে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কয়েক পা' গেলেই তো নদী। কিন্তু সে জল মুখে দিয়ে কি আর সেখান থেকে ফিরে আসা যাবে? যমের দোসর হিংস্র কুমীরগুলো হয়ত ওৎপেতে বসে আছে। হয়ত বা বালুর ওপরই সটান হয়ে পড়ে আছে।

জঙ্গলের ভেতরকার অন্ধকারের জমাটভাব গেছে, কিন্তু পাৎলা হয়নি। কেবল নদীর দিকটা একটু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। এবার অন্ধকার চারিদিকে পাৎলা পাৎলা দেখা যাচ্ছে। অল্প দূরের জিনিষ বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সর্ব্বনাশ! এ কি? জঙ্গলের এ কি ভীষণ রূপ? সমস্ত রাত কি পারিপার্শ্বিকের ভেতরই কাটিয়েছি! বাপ্ রে বাপ্!

এই চিরঅন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হিংস্রপ্রাণী পরিপূর্ণ নিবিড়তম জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় বলিভিয়ায় ফিরে যেতে পারব, এও কি সম্ভব? কল্পনাতেও যে মানুষ এ আশা পোষণ করে, সে পাগল নয় কি?

হাঁ, পাগল বই কি!—তবে যতক্ষণ শেষ রক্তবিন্দু থাক্‌বে শরীরে, ততক্ষণ সমানে লড়বো মৃত্যুর সঙ্গে। পরাজয় আমার হবে, তবুও ভয়ে বিভীষিকায় শুকিয়ে মরব না।

সেই আকাবাঁকা মোটা লতাটা বেয়ে গাছ থেকে নেমে এলাম। ভয় ভাবনা মন থেকে মুছে ফেলে যদি একবার জঙ্গলের এই অপরূপ রূপ দু'চোখ মেলে দেখা যায়, তা'হলে সত্যই একটা দর্শনীয় দৃশ্য নজরে পড়ে। সৃষ্টির আদিযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত সেখানে মানুষের পায়ের দাগ পড়েনি। জঙ্গলের গাছগুলোও কেউ কেটে নিয়ে যায়নি। কতকাল থেকে গাছগুলো ডালপালা মেলে লতাপাতায় জড়িয়ে রয়েছে। গাছ-গুলো যে কত প্রাচীন, তা তাদের গায়ের ফাটল আর মোটা মোটা লতাগুলোর দিকে চাইলেই বোঝা যায়। লতাগুলো কোথায়ও বা স্বতন্ত্র গাছ হয়ে ডালপালা মেলে খাড়া হয়ে উঠেছে, আবার কোথায়ও বা সেই মোটা গাছগুলোকে অজগরের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে উপরে উঠে গেছে। অসংখ্য লতা গাছ থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নীচের দিকে নেমেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বিরাট বিরাট সাপ গাছের ডালে লেজ পেঁচিয়ে দোল খাচ্ছে। কে না বলবে, যে অন্ধকারময় অজগরপুরী।

নদীর দিকে পা বাড়াতেই প্রথমে পথরোধ করল কাঁটাগাছের ঝোপ। গত সন্ধ্যায় অন্ধকারে এরই তলা দিয়ে সাপের মত বুকে হেঁটে এসে গাছে উঠেছিলাম।

ডানদিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম। আবছা আলো-আঁধারে প্রথমটা দেখতে পাইনি, তারপরই ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, ঝোপটার উপরে সেই জাগুয়ারটার মৃতদেহ পড়ে আছে। অসংখ্য রাক্ষস মশামাছিগুলো একেবারে ছেয়ে ধরেছে।

কাছে গিয়ে দেখলাম, আমার সেই ছোরাখানা জাগুয়ারটার পেটে আমূল-বিদ্ধ হয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি সেখানা টেনে তুলে নিলাম। আত্মরক্ষার ছোট একখানা অস্ত্র তবুও থাক কাছে। ভাগ্যি, এ সেই মরা জাগুয়ারটা। এ যা জঙ্গল, এখুনি গণ্ডাদশেক জাগুয়ার সামনে এসে হাজির হওয়াও ত কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

"গুড়ুম্ গুড়ুম্"............

এ কি! বন্দুকের শব্দ এখানে! ভুল শুনলাম না ত?

না,—ভুল শুনিনি। আমার কাণকে অবিশ্বাস করতে পারি না।

তবে কি আমাদের কোন সঙ্গী এখনও বেঁচে আছে? না এ ইণ্ডিয়ানদের বন্দুকের গুলীর শব্দ?

যাই-হোক, আমি আর চিন্তা করতে পারিনা। হ'লই বা ইণ্ডিয়ান, তবুও তারা ত মানুষ। মানুষের মুখ দেখতে চাই।

এ মৃত্যু-সঙ্কুল পারিপার্শ্বিকের ভেতর আমার যে নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে।

কাঁটাঝোপ দুর্ভেদ্য বেড়া রচনা করে নদীকূল পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। আবার শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে নদীর দিকে এগিয়ে চললাম। ঝোপের নীচেয় গাঢ় অন্ধকার, জায়গায় জায়গায় কাঁটালতা গায়ে আটকে যাচ্ছে, মুখে বেধে যাচ্ছে, কিন্তু আমার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। বন্দুকের শব্দ যেন আমায় চুম্বকের টানে টানে নিয়ে চলেছে।

আলো দেখা যাচ্ছে—নদীর জলস্রোতের কল্‌কল্ শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর একটু—আর একটু এভাবে এগোতে পারলেই নদী।

নদী—নদী—হু হু ক'রে ব'য়ে চলেছে ঐ নদী। ঝোপ ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস শরীরটাকে যেন জুড়িয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু বন্দুকের শব্দ করল কে?—কই কাউকে ত দেখতে পাচ্ছিনে। এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছি, হঠাৎ 'হা' 'হা' শব্দে একটা অট্টহাসি মাথার উপরে একটা গাছ থেকে ভেসে এল।

বুকের স্পন্দন থেমে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। এ নিশ্চয়ই অসভ্য ইণ্ডিয়ান,—শীকারের সন্ধানে ওৎপেতে বসে আছে। এদের ভয়ানক অত্যাচারের কাহিনী অনেকবার শুনেছি। আমি মুখ তুলে তাকাতেও পারলাম না।

আবার সেই অট্টহাসির শব্দ শুনলাম, কিন্তু এবার আমার

কেবল পিছনে,—বোধ হয় পাঁচহাত মাত্র দূরে। শুকনো পাতার উপর তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সাহসে ভর ক'রে পিছনদিকে তাকাতেই একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। ইণ্ডিয়ান বটে—তবে নরখাদক নয়। অর্দ্ধসভ্য ইণ্ডিয়ান—আমাদের একান্ত প্রিয় ভৃত্য মামারু।

এত দুঃখেও মনের আনন্দ আর ধরে রাখতে পারলাম না। আমি ভুলে গেলাম, যে আমি সভ্য জগতের একজন শিক্ষিত মানুষ আর সে আমার ইণ্ডিয়ান ভৃত্য। তাকে দৌড়ে গিয়ে জাপটে ধরলাম। মনে হ'ল, কতকাল—কতকাল যেন মানুষের মুখ দেখিনি। মানুষকে দেখে মানুষ আর কবে এত আনন্দ পেয়েছে ?

—ছয়—

আমাদের দু'জনেরই মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল, কিন্তু এক মুহূর্ত্ত মাত্র। তারপরই বিষাদের গাঢ় কালিমা কে যেন আমাদের সমস্ত মুখে লেপে দিল।

মামারুকে বললাম, "আর কেউ বোধ হয় জল থেকে উঠতে পেরেছিল না ?" একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মামারু বলল, "না—বোধ হয়। যদি কাউকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাই, এই ভরসায়ই বন্দুকের আওয়াজ করেছিলাম।"

বললাম, "বন্দুকটা নিয়ে কি ভাবে সাঁতরে এসেছিলি ?"

মামারু বলল, "নৌকোর গোলুই যখনি সাপটা প্রথম কামড়ে ধরল, তখনই আমি বুঝেছিলাম, ওর উদ্দেশ্য নৌকো ডুবিয়ে দিয়ে আমাদের ধরে খাওয়া। কিনারার প্রায় কাছ দিয়েই ত নৌকো চালাচ্ছিলাম,—আমি এক মুহূর্ত্তেই বুঝে নিলাম যে বন্দুক সাথে না থাকলে এ জঙ্গলে গিয়ে সাঁতরে ওঠাও যা, না ওঠাও তাই। নৌকোটাকে যখন সাপটা একেবারে জলের ওপর উপুড় করে ফেলল, তার আগেই আমি বন্দুকটা হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। চামড়ার কোমরে বাঁধা ব্যাগে কার্টিজ ত ভর্ত্তিই ছিল। ব্যাগটার ভেতর একটুও জল ঢুকতে পারেনি।

নিজের বিপদের কাহিনী তাকে সমস্ত বললাম। মামারু বলল, সেও অতিকষ্টে এই গাছের উপর ওঠে কোনমতে রাত কাটিয়েছে।

বল্‌লাম, "মামারু, সারাজীবন এখানে বুক ফাটিয়ে চীৎকার করে কাঁদলেও তারা আর ফিরে আসবে না। আমাদের ত বাঁচতে চেষ্টা করতে হবে। এ যা নদীপথ, এ পথে ত আর এক পাও এগোতে পা সরে না। আর নৌকোই বা কোথায় ? —আর এ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগোবই বা কি করে ?"

মামারু বললে, "জলেই হোক্ আর জঙ্গলেই হোক্, পথ ক'রে নিতেই হবে। এখানে ত আর সারাজীবন বসে কাটান যাবে না। যা-হোক একটা ঠিক করছি, ব্যস্ত হবেন না। আমরা ত আর খুব বেশীদূর এসে পড়িনি। খানিকটা এগোলেই

খালের মুখ পাবো,—তারপর খাল ধ'রে দিন তিনেক চল্‌লেই আমাদের আর পায় কে?"

বললাম, "আমাদের পাওয়ার জন্যে এ সব জায়গায় মানুষ বা জন্তু কিছুরই অভাব নেই মামারু।"

মামারু একটু হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বিপদ যে কতখানি মাথার ওপর, সে বোধহয় ভাল ভাবেই জানে।

মামারু বলল, "বড্ড ক্ষিধে পেয়েগেছে, আসুন কিছু শীকার ক'রে আগে খেয়ে নেওয়া যাক্।"

বললাম, "ক্ষিদে চুলোয় যাক্, পিপাসায় একেবারে বুক ফেটে যাচ্ছে। একটু জল আগে খেয়েনি।"

নদীর দিকে যেই এক পা বাড়িয়েছি, মামারু আমার হাত টেনে ধরল, বলল, "করেন কি আপনি? এ জলে এত লবণ যে আপনি মুখেই দিতে পারবেন না। তারপর কুমীর একেবারে কিল্‌বিল্ করছে, ঐ দেখুন!"

চম্‌কে উঠে সুমুখে তাকিয়ে দেখলাম, দুটো কুমীর মানুষের গন্ধ পেয়ে একেবারে কিনারায় এসে মুখ ভাসিয়ে দিয়েছে। যেন ডাঙ্গায় উঠে আসতে চায়।

সর্ব্বনাশ! ভাল করে না দেখেই এগিয়েছিলাম, আর একটু হলেই গিয়েছিলাম আর কি! মৃত্যু তার করাল-বদন বিস্তার করে হা করেই আছে চারদিকে। কোথাও নিস্তার নাই দেখি।

মামারুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাতেই বললে, "আসুন, আপনাকে ভাল জল খাওয়াচ্ছি, ঘাবড়াবেন না।"

নদীর কিনারা ধরে পলি ও পাঁক মাড়িয়ে উত্তরে বরাবর খানিকটা এগিয়ে গেলাম। ঘন সন্নিবিষ্ট বাঁশের ঝোপ সুমুখে রেখে ডাইনে ঘুরে আমরা জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। দশহাত পনেরহাত পর্য্যন্ত বেশ দৃষ্টি চলে, তারপরই সব ঝাপ্‌সা দেখায়।

প্রায় আধঘণ্টা হেটে মামারুর ইঙ্গিতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালাম। এ জায়গাটায় জঙ্গল কিছু খোলা। প্রায় পঞ্চাশ হাত দূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার নজর চলে।

মামারু আমার কাছ থেকে ছোরাখানা চেয়ে নিল। কারণ জিজ্ঞেস করতেই শুধু একটু হাসল, কোন কথা বলল না।

একটা কুণ্ডলী পাকান সর্পাকৃতি মোটা লতার গায়ে সে অনবরত তীক্ষ্ণধার ছোরাখানা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! লতা এত শক্ত যে কাটতে চাইছে না, যেন পাথরের মত শক্ত।

বড় বিস্ময় বোধ হ'ল। আচ্ছা দেখাই যাক্, ওর দৌড় কতদূর! কি মতলবে এ শক্ত লতা ও কাটতে আরম্ভ করেছে!

মামারু বলল, "শীগ্‌গির আসুন, জল পড়ে যাচ্ছে। শীগ্‌গির"—

কাছে দৌড়ে গেলাম। অবাক হয়ে দেখলাম—তাইত! দিব্যি পরিষ্কার জল গড়িয়ে পড়ছে। একেবারে যাকে বলে—স্ফটিকের মত।

মুখে দিয়ে দেখলাম, কি সুন্দর! কি মিষ্টি! যেন ঝরণার জল। আকণ্ঠ পান করলাম, তবুও যেন খেতে ইচ্ছে করে।

সঙ্গে এমন একটা পাত্র কিছুই নেই যে খানিকটা সঙ্গে করে নিয়ে যাব !

মামারুও জল খেয়ে নিয়ে বলল, "কি রকম খেলেন ?"

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু একটু হাসলাম।

মামারু বলল, "সিপো লতা, এ জঙ্গলে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এগুলোর ভেতর কি রকম জল পাওয়া যায় দেখলেন ত ? এত শক্ত লতার ভেতরেও"......

কয়েক হাত দূরে একটা পাতার খস্ খস্ শব্দে হু'জনেই চমকে উঠলাম। মামারু আঙ্গুল দিয়ে দেখাতেই বন্দুক তুলে ধরলাম। দেখলাম একটা জানোয়ার। মামারু বলল, "গুলী করুন, আর্ম্মো।"

বন্দুক লক্ষ্য করতেই অবাক হয়ে দেখলাম, জানোয়ারটা আমাদের দেখতে পেয়েই হঠাৎ শরীরের একটা কঠিন আবরণ ফুলিয়ে দিয়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, পালাল না।

মামারু বল্ল, "ছাড়বেন না—গুলী করুন শীগ্‌গির—ওর মাংস খুব"—সমস্ত জঙ্গলের নিষ্ঠুর নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে বন্দুকের গুলী বেরিয়ে গেল। মামারু ছুটে গেল। কাছে গিয়ে দেখলাম, এক গুলীতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। জন্তুটার অবয়ব বেশ ক'রে দেখে আমার মনে পড়ল, 'আর্ম্মাডিলার' কথা বইতে পড়েছি, ছবিও দেখেছি, এ সেই জানোয়ারই বটে। মামারু সেই জন্যেই বল্‌ছিল 'আর্ম্মো।'

ক্ষুধার্ত্ত মামারু ছোরাখানার সাহায্যে আর্ম্মাডিলাটার চামড়া

ছাড়িয়ে ফেলল। তারপর খণ্ড খণ্ড করে মাংস কেটে চামড়ার উপর রাখতে লাগল।

বললাম, "এবার কি হবে ?"

মামারু না তাকিয়েই বললে, "আগুনে সেঁকে নিয়ে খাওয়া হবে, কিন্তু দিয়াশলাই ত নেই।"

বললাম, "তাহ'লে কি করবে, কাঁচাই খাবে বোধ হয়।"

আপন মনে মাংস ছাড়াতে ছাড়াতে মামারু বলল, "না—আগুন জোগাড় করতেই হবে, দেখি ত !"

মনে মনে একটু হাসলাম। এ ভূতুড়ে জঙ্গলে হয়ত সবই অদ্ভুত। এক গাছের লতা থেকে জল বার ক'রেছে, আবার হয়ত আর এক গাছ থেকে আগুন বার ক'রবে। দেখাই যাক !

মাংস ছাড়াতে ছাড়াতে মামারু হঠাৎ যন্ত্রণাসূচক চীৎকার করে উঠল। ধারালো ছোরায় লেগে হাত পা কেটে ফেলল না কি ?

তাড়াতাড়ি কাছে যেতেই সে যন্ত্রণাবিকৃত মুখে শুধু বলল "পিঁপড়েয় কামড়েছে।"

অতি দুঃখেও হাসি এল। বললাম, পিঁপড়ের কামড়েই এতটা"·········সে শুধু আঙ্গুল দিয়ে আমায় দেখাল।

তাকিয়ে দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড পিঁপড়ে—সাধারণ ছোট পিঁপড়ের অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশগুণ বড়,—মাটীর ভেতর একটা গর্ত্তের মুখে মুড় বাড়িয়ে আছে। মামারুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মুখখানা তার যন্ত্রণায় লাল হয়ে উঠেছে। সর্ব্বনাশ !

কি ভীষণ পিঁপড়ে রে বাবা! এখানকার পোকা মাকড়গুলো পর্য্যন্ত হিংস্রতা ছাড়া আর কিছুই জানে না দেখছি।

বললাম, "ব'সে থেকে আর লাভ নেই মামারু। তাড়াতাড়ি খাওয়ার পর্ব্ব শেষ করে ফেল। বেলা কিন্তু বেড়ে উঠেছে।"

মামারু আশপাশ থেকে কতকগুলো শুকনো কড়কড়ে পাতা আর গাছের ছোট ডাল এনে জড়ো করল, তারপর আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে শুকনো পাতা ও ডালের স্তূপ লক্ষ্য করে 'গুড়ুম্' 'গুড়ুম্' করে দুবার গুলী ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে বারুদের মত আগুন জ্বলে উঠল। মনে মনে মামারুর বুদ্ধির তারিফ না ক'রে আর পারলাম না। সে মাংসর সব খণ্ডগুলো আগুনের ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দিল। জ্বলন্ত আগুনের শিখা অনেকখানি জায়গা আলোকিত করে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের ভেতর একটা মহাজাগরণের সাড়া পড়ে গেল। এ জঙ্গলের জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত এর গাছপালা জীবজানোয়ার কিছুই ত আলোর মুখ চোখে দেখেনি। অন্ধকার এ জঙ্গলের একচ্ছত্র রাজা। অন্ধকার রাজ্যে বাস ক'রে ক'রে আলোর রূপ দেখে সবাই ভয়ে পালাতে লাগল।

গাছের ওপরের ডালে কতকগুলো মাকড়শা-বানর লেজ দিয়ে ডাল জড়িয়ে দোল খাচ্ছিল, আগুনের রূপ দেখেই ভয়ে লাফিয়ে অন্য গাছে ছুটতে লাগল। কিন্তু এইটেই দেখবার জিনিষ যে ওরা লাফিয়ে হাত পা দিয়ে ডাল আঁকড়ে ধরে না, লেজ দিয়ে জড়িয়ে ধরে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছি, হঠাৎ মৌমাছির গুঞ্জনের মত একটানা একটা 'গুণ' 'গুণ' শব্দ কাণে ভেসে এল।

মামারু চীৎকার করে উঠল, "মৌমাছির চাকে আগুনের ধোঁয়া লেগেছে, শীগ্‌গির এদিকে আসুন, আপনার মাথার উপর এক ঝাঁক্"............

একবার উপর দিকে তাকিয়েই আমার মুখ শুকিয়ে গেল। বাপরে,—ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি উড়তে আরম্ভ করেছে। যে গাছের তলায় আগুন দেওয়া আছে, সেই গাছেরই একটা ডালে মৌমাছি চাক বেঁধেছে।

এক লাফে আগুনের একেবারে ধারে গিয়ে পড়লাম। মামারু বলল "শীগ্‌গির শুয়ে পড়ুন আগুনের গা ঘেঁসে। এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কল্পনাও দুরাশা।"

যথাসম্ভব আগুনের কোল ঘেঁসে সটান মামারুর পাশে শুয়ে পড়লাম। ধূ ধূ করে আগুন জ্বলছে। ধোঁয়াও উঠছে যথেষ্ট।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, মৌমাছিগুলো কত অনিচ্ছায়—রাগে—অভিমানে গুণ গুণ ক'রে সমস্ত জঙ্গলকে তাদের দুঃখের কাহিনী জানিয়ে দলে দলে উড়ে চলে যাচ্ছে,—কতক বা আশে পাশে এখনও ঘুরছে। কিন্তু আগুনের কাছে আসতে পারছে না।

চাক্‌খানাই বা কত বড় যেন ডালটা জুড়ে চাক বেঁধেছিল, বোধ হয় আট দশহাত লম্বা হবে। কাল কাল মৌমাছিগুলো এমনভাবে চাকখানাকে ঢেকে রেখেছিল যে গাছের ডালের রংএর

সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিল। আগে দেখতেই পাইনি, যে ওখানে মৌচাক আছে।

মামারু আশপাশ থেকে কতকগুলো ভিজে আগাছা জ্বলন্ত আগুনের উপর ফেলে দিল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় এবার একাকার হ'য়ে গেল। ধোঁয়ার সে তীব্র জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সমস্ত মৌমাছিগুলো উড়ে গেল। প্রকাণ্ড ধবধবে সাদা চাকখানা বেরিয়ে পড়ল।

মামারুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মধু খাওয়ার আনন্দে তার সমস্ত মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা ক'রেই মামারু তর্ তর্ ক'রে গাছ বেয়ে উঠে গেল, তারপর ছোরা দিয়ে যতখানি পারল, 'চাক' কেটে নিয়ে নেমে এল।

আমার হাতে দিয়ে বললে, "ধরুন, মাংসের সঙ্গে মধুর চাটনী খুব ভাল লাগবে। এইবার আগুন সরিয়ে মাংস বার ক'রে ফেলি।"

মুখে দিয়ে দেখলাম, বাস্তবিকই তাই, চাটনীই বটে। মামারু ঠিকই বলেছে। এ জঙ্গলের মধু একেবারে মিষ্টি নয়, যাকে বলে অম্লমধুর! মাংসের সঙ্গে খাওয়ার উপযুক্ত জিনিষই বটে।

আমারও ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল যথেষ্ট। কিন্তু মামারুর মাংস পোড়ানোর রীতিনীতি দেখেই ত আমার চক্ষুস্থির। আমি ভাবতেই পারলাম না, কি করে ও মাংস মুখে তুলবো। বিশেষ আবার আর্ম্মাডিলার মাংস, না জানি সে কেমন।

মামারু আগুনের স্তূপ ভেঙ্গে ফেলল। তারপর একখানা ডালের সাহায্যে মাংসের বড় খণ্ডগুলো কাছে টেনে নিয়ে এল।

করুণ নয়নে মাংসগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, অমন যে লাল টক্‌টকে মাংস,—আগুনে আধপোড়া হয়ে আর ছাইভস্ম লেগে যেন নিকশ কালির রং ধারণ করেছে।

মামারুর কাছে এ মাংস যতই প্রিয় হোক্, আমার কাছে নয়। বললাম,—"এ কি করেছিস্ মামারু, এ কি মুখে তোলা যাবে? আধকাঁচা ছাঁছড়া-পোড়া মাংস খাব কি করে?"

একগাল হেসে মামারু বলল, "সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

আশপাশ থেকে কতকগুলো বড় বড় পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এসে মামারু মাটিতে বিছালো। তারপর ছোরাখানা দিয়ে মাংসের ময়লা এক পর্দ্দা উপর থেকে ফেলে দিয়ে রাখতে লাগল।

ওদিকে আগুন প্রায় নিভে গিয়েছে, অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে মাত্র।

— দশ —

দু'জনেরই মন আহারের দিকে, আর কোনদিকে দৃষ্টি নাই, তাকাবার অবসর পর্য্যন্ত নেই, ঠিক এমনি সময়ে মাথার কিছু ওপরে গাছের ডাল যেন নড়ছে মনে হ'ল। মনে করলাম, হয়ত বানর বা বানরজাতীয় কোন প্রাণী হবে। গাছের ডালে ডালে বেড়াচ্ছে।

মামারু হঠাৎ উপর দিকে তাকিয়েই সত্রাসে চীৎকার করে উঠল, "বাঘ বাঘ—প্যান্থার--শীগ্গির বন্দুক—ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল"......

বন্দুকটা পাশেই ছিল, তাড়াতাড়ি তুলেই গুলী করলাম, কিন্তু গুলী তার গায়ে লাগবার আগেই স্যাঁৎ করে আর এক ডালে লাফিয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় টোটা পুরা ছিল না। টোটা পুরতে পুরতে চোখের নিমেষে ঘন সন্নিবিষ্ট ডালপালা ও পাতার আড়ালে কোথায় যে লাফিয়ে গিয়ে প্যানথারটা লুকালো, আর তাকে দেখতে পেলাম না। কি শয়তান জানোয়ার! কেমন ভাবে গাছপালার উপর দিয়ে গা ঢেকে এসেছে।

অতর্কিতে আবার এসে আক্রমণ করতে পারে ভেবে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছি,—হঠাৎ পশ্চিমদিক থেকে শন্ করে একটা তীর এসে গাছের গুঁড়িতে বিঁধে গেল।

আর একটু হলেই আমায় এ ফোঁড় ও ফোঁড় করেছিল আর কি !

মামারু দেখেই চীৎকার করে উঠল, "ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসছে, শীগ্‌গির গাছের গুঁড়ির আড়ালে আসুন, গায়ে লাগলেই একেবারে শেষ।"

এক লাফে গিয়ে গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম, সঙ্গে সঙ্গে শন্ শন্ শব্দে তীরের পর তীর এসে গাছের গায়ে, এদিকে ওদিকে বিঁধতে লাগল। একটা তীর আমার পাশেই এসে ছিট্‌কে পড়ল, তাকিয়ে দেখলাম সেটা প্রায় দশ ফিট লম্বা, আর তার পিছনে অদ্ভুত কৌশলে পাখীর পালক এঁটে দেওয়া। সম্ভবতঃ লক্ষ্য স্থির রাখবার জন্যে।

মামারু থর্ থর্ করে কাঁপছিল। অভয় দিয়ে বললাম, "কোন ভয় নেই, হাতে বন্দুক থাকতে আমাদের গায়ে হাত দেয় কার সাধ্য ! আসুক না একবার।"

মামারু কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, "খবরদার গুলী ছুঁড়বেন না, তা'হলে আর কিছুতেই এদের হাতে রেহাই পাওয়া যাবে না। একটা বন্দুকের ওই কয়টী কার্টি্‌জ দিয়ে ওদের কটাকে আপনি মারবেন ? ওদের ঐ বিষমাখান তীরগুলো বন্দুকের চেয়েও ঢের বেশী কাজের। শরীরে কোথায়ও একটু লাগলে সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু—তা আপনি জানবেন। সন্ধি করাই একমাত্র উপায়, একবার সেই চেষ্টা করে দেখি।"

বলতে বলতে একদল জংলী হৈ হৈ করতে করতে এদিকে

ছুটে আসছে মনে হল। গাছের আড়াল থেকে উঁকিমেরে দেখলাম, প্রায় ত্রিশজন জংলী ইণ্ডিয়ান এদিকে দৌড়ে আসছে। পরণে সামান্য একটু গাছের পাতা, উলঙ্গ বললেই চলে। গায়ের রং ঘোর তামাটে—সারা গায়ে হাড়ের গয়না পরা আর উল্কি আঁকা।

কি ভীষণ দর্শন তারা—দেখেই আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল—মুখখানা সাদা হয়ে গেল। বন্দুক ছোঁড়ার কল্পনাও আমার মন থেকে মুছে গেল।

দেখতে দেখতে তারা কাছে এসে পড়ল। 'হিংস্রতায় এরা যে কোন ভয়ঙ্কর জন্তু জানোয়ারকে ছাপিয়ে যায়', 'সভ্য মানুষ এদের ত্ব'চোখের বিষ'—এ সব কাহিনী অনেকবার শুনেছি, পুঁথিতে পড়েছি কিন্তু আজ যে হাড়ে হাড়ে নিজেই তা অনুভব করতে হবে, একটু আগেও তা ভাবিনি। আমি বন্দুক ফেলে দিয়ে হাত উঁচু করে দাঁড়ালাম।

মামারু তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পরস্পর ওদের ভাষায় কি কথাবার্ত্তা হতে লাগল, তা না বুঝলেও এটুকু অনুভব করলাম যে মামারু চাইছে ওদের সঙ্গে সন্ধি করতে, ওদের বন্ধু বলে গ্রহণ করতে। কিন্তু তারা তা হঠাৎ শুনবে কেন? তারা কেবলই উত্তেজিত হয়ে আমায় আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে লাগল। অর্থাৎ তাদের আমাকে একান্ত প্রয়োজন। মামারুর এত অঙ্গভঙ্গী, এত কাকুতি মিনতি সব যেন ফাঁসির হুকুম হয়ে যাওয়া আসামীর পক্ষের উকীলের অনুরোধের মত কোথায় ভেসে যেতে লাগল।

ছুটো ষণ্ডামার্ক ইণ্ডিয়ান বিকট দন্তপাতি বার করে আমার দিকে হিংস্র দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছিল। তারা মামারুকে এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আমার দিকে এগোতেই, আমার ইচ্ছে হল, দিই দু'ব্যাটার মাথার খুলি উড়িয়ে। এদের হাতে যখন পড়েছি, তখন ত মৃত্যু নিশ্চিত, তবে আর অত ভয় কিসের!

মামারু কিন্তু দৌড়ে এসে এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। আমার কোমরে বাঁধা কার্টি্জের ব্যাগটা, আমাদের বন্দুকটা, আর্ম্মাডিলার অতখানি মাংস, অতখানি মধুর চাক—সব নিয়ে গিয়ে সর্দ্দারটার পায়ে গড়িয়ে পড়ল। আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে ওদের ভাষায় অনর্গল মিনতির স্বরে কি বলে যেতে লাগল। বুঝলাম, সর্দ্দারকে এগুলো সব উপহার দিয়ে হয় আমার প্রাণভিক্ষা চাইছে, অথবা বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রে রেহাই পেতে চাইছে।

বন্দুকটা হাতে পড়তেই কিন্তু সর্দ্দারের মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখতে পেলাম। মামারু কার্টি্জের ব্যাগটা নিজে হাতে তার কোমরে বেঁধে দিতেই সর্দ্দার খুসী হয়ে সঙ্গীদের নিরস্ত হতে হুকুম করল। তারা ক্ষুণ্ণমনে আমার দিকে একবার কট্মট্ করে তাকিয়ে ওদিকে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আবার হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল। কিন্তু ফেরবার সময় তাদের মুখে আনন্দ আর ধরে না।

এত সাধের আর্ম্মাডিলার মাংস, এত আশার মধু সব এসে জংলীগুলো চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। শেষ সম্বল বন্দুকটা, তা পর্য্যন্ত গেল। অথচ না দিয়ে উপায়ই বা কি

ছিল। কিন্তু এই জঙ্গলে বন্দুক হাতে থাকতেই পদে পদে বিপদ, আর খালি হাতে ?······

একান্ত অনুগত ভৃত্য মামারু কাছে এসে ঘাড় নীচু করে দাঁড়াল। যেন নিতান্ত অপরাধী। অনেকের মুখে পূর্ব্বে শুনেছিলাম যে দক্ষিণ আমেরিকার অর্দ্ধসভ্য ইণ্ডিয়ানরা এত অনুগত যে প্রয়োজন হলে মনিবের জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না। আজ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম। বাস্তবিক এদের প্রাণ আছে।

বললাম, "মামারু, এখনও প্রাণের আশা করিস্? জলে, ডাঙ্গায়, গাছের উপরে—চারিদিকে যমদূত, প্রতি মুহূর্ত্তে এদের সুমুখে পড়তে হবে, অথচ আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, তার উপর এই নিবিড় অন্ধকারময় জঙ্গল,—এ জঙ্গলের শেষ যে কোথায় তাও জানি না। তবুও আশা করিস্, আমরা ফিরে যেতে পারব।"

মামারু ঘাড় নীচু করে চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না। বললাম, "এ যা জঙ্গল দেখতে পাচ্ছি, ফলফুলারী ত কিছুই নাই। কিছু শীকার করে যে খাবে, সে উপায়ও নাই, বন্দুকটা হাতছাড়া হয়েছে। তার উপর যে কোন মুহূর্ত্তে জাগুয়ার, পিউমা, টেপীর বা পেকারীর দলের সুমুখে পড়ে যেতে পারি। আর এবার না হয় অসভ্যদের একটা দলকে বন্দুক আর খাবার দিয়ে বিদায় করলে, কিন্তু ঐ একটা দলই ত শুধু এ জঙ্গলে বাস করেনা। আবার যখন নতুন একটা দলের সঙ্গে দেখা হবে, তখন কি দিয়ে তাদের বিদায় করবে? তখন ত আর

নিজেদের না বিলিয়ে দিয়ে রেহাই পাবেনা। তার চেয়ে ঢের ভাল ছিল, কাল সন্ধ্যায় সঙ্গীদের সঙ্গে জলে সমাধি নেওয়া বা কুমীর আর সাপের পেটে যাওয়া। না খেয়ে—শুকিয়ে হোক্, অসভ্যদের হাতে হোক্, বা জন্তুজানোয়ারের হাতেই হোক্,—মরতেই যখন আমাদের হবে, তখন কি লাভ, এভাবে তিলে তিলে মরণ যন্ত্রণা ভোগ ক'রে ?"

মামারু কোন কথা বলল না, আমার দিকে তাকালও না। শুধু এদিকে ওদিকে একবার তাকিয়ে আবার গাছ বেয়ে উঠতে গিয়েই "বাপরে"—বলে লাফিয়ে পিছিয়ে এল।

চমকে উঠে দাঁড়ালাম, তারপর মামারুর নির্দ্দেশে উপর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড হলুদ রংএর সাপ গাছের ডাল লম্বা শরীরে আচ্ছা ক'রে পেঁচিয়ে সেই মৌচাকখানা থেকে মধু খাচ্ছে। মামারুকে জিজ্ঞেস করতে জানলাম, মধুর চাক আবার খানিকটা কেটে নিয়ে আসার জন্যেই সে গাছে উঠছিল।

বললাম, "মামারু, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও নয়, শীগ্গির চল্। নদীর দিকেই এখন আমাদের যেতে হবে।"

অসভ্যদের পরিত্যক্ত কতকগুলো বাণ ইতস্ততঃ পড়েছিল। মামারু যতগুলো পারল, সেগুলোকে কুড়িয়ে নিল। বিপদে পড়লে মানুষ তার স্বাভাবিক বুদ্ধি যেমন হারিয়ে ফেলে, তেমনি আবার অনেক রকম উৎকট বুদ্ধি তার মাথায় গজিয়ে ওঠে।

বললাম, "ওগুলো দিয়ে কি হবে মামারু ?"

মামারু স্বভাবতঃই অল্পভাষী। বলল, "দুটো ধনুক এবার তৈরী ক'রে নিতে পারলে এ জঙ্গলে পা বাড়ান চলবে।"

অতি দুঃখের হাসি হেসে বললাম, "কি রকম ?"

মামারু কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ না করে বলল, "এ একেবারে মৃত্যুবাণ, লক্ষ্য অব্যর্থ হ'লে শীকারও অব্যর্থ, আসুন, দুটো ধনুক আগে তৈরী করে নেওয়া যাক্, পরে অন্য কথা।"

যে কথা সেই কাজ। তিন মিনিটের মধ্যেই দুটো ধনুক তৈরী হয়ে গেল। একটা গাছের আধ ইঞ্চি মোটা আড়াইহাত লম্বা দুটো ডাল কেটে নিয়ে দুপাশ থেকে বেঁকিয়ে লতা দিয়ে ছিলা বাঁধা হ'ল। তীরগুলোকে তাড়া বেঁধে কোমরে ঝুলিয়ে মামারু বলল, "এবার চলুন, কোন্‌দিকে যেতে হবে।"

কয়েকটা তীর আর একটা ধনুক আমার হাতে দিয়ে বললে, "তীরের ফলা যেন গায়ে ছোঁয়া লাগে না, খুব সাবধান! এই দেখুন বিষমাখান রয়েছে, কেমন তেল তেল মত চক্ চক্ করছে!"

তাকিয়ে তা দেখলাম। বললাম, "এ বিষ কিসের মামারু ?"

মামারুর মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। বলল, "গাছের বিষ। এত ভয়ঙ্কর বিষ সাপেরও নয়। নাকের কাছে নিয়ে শুঁকলেও মৃত্যু অনিবার্য্য। এ গাছের বাতাস এসে গায়ে লাগলেও বিপদ।"

অবাক হয়ে বললাম, "বলিস্ কি রে ? এ জঙ্গলে সে গাছ আছে না কি ?"

"অভাব কি ? চলতে চলতেই আপনাকে দেখাবো'খন।

ঐ গাছগুলো থেকে বিষাক্ত রস নিয়েই ত জংলীরা শীকার করে; জন্তুজানোয়ার, মানুষ, এমন কি সাপ পর্য্যন্ত মারে। জাগুয়ার, পিউমা, প্যানথার,—সমস্ত জানোয়ার এ তীরের কাছে একেবারে ঠাণ্ডা।”

আবার আমরা নদীর দিকে চলতে লাগলাম। সমস্ত বন নিস্তব্ধ, চারিদিকে তাকালে গা ছম্‌ছম্ করে ওঠে, যেন জঙ্গলের সমস্ত গাছপালাগুলো পর্য্যন্ত নিশ্বাস বন্ধ ক'রে হিংস্র দৃষ্টি মেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। শুক্‌নো পাতার ওপর পা পড়লেও ওগুলো যেন রেগে উঠছে। কি রকম একটা অস্বাভাবিক শব্দ বেরুচ্ছে।

জায়গায় জায়গায় ব্রেজিল বাদামের গাছগুলো যেন আকাশ ফুটো ক'রে উঠে গিয়েছে। কোথায় কত উচে গিয়ে সেগুলোর শেষ হয়েছে কাছাকাছি থেকে তা বুঝবার উপায় নাই। আর সেই অনুপাতে গাছগুলো মোটা!—যেন জঙ্গলের সমস্ত গাছ-গাছালির রাজা এরা। সবার উপরে মাথা তুলে সর্ব্বক্ষণ সকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখছে।

এ সময়কার মনের অবস্থা আমার, বুঝিয়ে বলার সাধ্য নাই। কোথায় আছি—কোথায় চলেছি—কিছুই যেন খেয়াল নেই,—যা থাকে কপালে তাই-ই হবে—এর চেয়ে বেশী সান্ত্বনা আর এসব ক্ষেত্রে কিইবা থাকতে পারে!

বললাম, “নদীতীরে আর গিয়ে কি লাভ মামারু? নদীপথে উজান স্রোত ঠেলে এগুনো ত আর সম্ভব হবে না। তার চেয়ে

চল বরাবর জঙ্গলের ভিতর দিয়েই। খালের মোহানা থেকে কতদূরই বা এসেছি। মোহানা পর্য্যন্ত গিয়ে, ওখান থেকে দিন তিনেকের পথ। আশা ত হচ্ছে বেরিয়ে যেতে পারব। উঃ, আমি আশা করতে পারিনি, মামারু, যে বিপদ এত শীগ্‌গির আমাদের সুমুখে এসে উপস্থিত হবে। বাপরে, কি ভয়ঙ্কর সেই সাপটার আকৃতি। আমি এখনও যেন সেটাকে চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি!

— এগার —

নদী বাঁয়ে রেখে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সবে কয়েক পা এগিয়েছি, কিন্তু আর একটী পা এগোয়, কার সাধ্য আছে! জঙ্গল যেমনি গভীরতর এবং অন্ধকারময়, তেমনি একেবারে ঠাসা ঘন কাঁটাগাছের বন। সে কি বিশ্রী কাঁটা! সে গাছগুলোর ডালে ডালে পাতায় পাতায়, যেন হাজারে হাজারে সূচ-ফল ফলে আছে। তার ভেতর দিয়ে পথ করে পা বাড়াতে যে চায়, তাকে পাগল ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে!

মামারু বলল, "এ টুবাক্‌ল বন ঠেলে এগোনো যাবে না। চলুন আমরা এই কাঁটাবন বাঁয়ে রেখে নদী পিছনে রেখে আরও জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ি। যেখানে গিয়ে দেখতে পাব এ বন শেষ হয়েছে, সেখান থেকে আবার মোহানার দিকে এগোতে

থাকব। আমি নিশ্চয় আপনাকে বলছি, উত্তরের দিকে সোজা খানিকটা হাঁটতে পারলেই খাল পাব।”

আশার একটু ক্ষীণ রেখা দেখতে পেয়ে আবার জঙ্গলের ভেতর দ্রুতপায়ে চলতে লাগলাম। কিন্তু, এ কি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে চল্‌ল, ঝোপঝাড় গাছপালা ঠেলে এগিয়ে চলেছি ত চলেছিই, কাঁটাবন আর শেষ হয় না। আশা হয়, একটু এগিয়েই হয়ত দেখতে পাব যে কাঁটাবন শেষ হয়ে গেছে। আশায় আশায় আর একটু চলি, কিন্তু হায়! সবই বৃথা। এরাও আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে। যেন চারিদিক থেকে পিষে আমাদের মারতে চাইছে!

পর পর কয়েকটা তালজাতীয় গাছ দেখতে পেলাম। আশার আনন্দে উন্মত্তের মত ছুটলাম। এবার তা হলে কাঁটা-বনের হাত থেকে রেহাই পেলাম। জয় ভগবান!

এ কি? হা কপাল!—এখানেও কি মরুর মরীচিকা? কাছে গিয়ে দেখলাম এখান থেকে আরম্ভ হয়েছে ফণিমনসা-জাতীয়···কাঁটাগাছের বন। এ বন আবার কতদূর চলে গিয়েছে, কে জানে! মামারু বলল, “কাজ নেই আর বেশী জঙ্গলে এগিয়ে। চলুন, নদীর দিকে এবার ফিরি। নদীর কিনারা বেয়েই এগোনো যাক, তারপর যা থাকে বরাতে।”

ভালমন্দ বিচার করে চলবার মত মনের অবস্থা তখন আর নাই। একটা নিশ্বাস ফেলে শুধু বললাম, “চল।”

বলতে না বলতেই একটা ‘ভোঁ ভোঁ ভন্ ভন্’—একটানা

শব্দের মত কাণে এল। মামারু এক মুহূর্ত্ত কাণপেতে শুনেই ভয়ার্ত্তস্বরে বললে, "সর্ব্বনাশ, এ যে ভীমরুলের ঝাঁক উড়ে আসছে এদিকে। এখুনি ছেঁকে ধরবে এসে। শীগ্‌গির ঐ ঝোপটার ভেতর লুকিয়ে পড়ি আসুন।"

কাঁটাঝোপ ঠেলে তার ভেতর ঢুকে পড়লাম। নাকের ডগায় কাঁটার ঘা লেগে দর্ দর্ করে রক্ত পড়তে লাগল।

মামারু ফিস্ ফিস্ করে বল্‌ল, "শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন। দেখতে যদি একবার পায়, তবে মৃত্যু নিশ্চিত। এদের হাতে পড়লে কিন্তু রেহাই নেই।"

ঝোপের ভেতর যথাসম্ভব শরীরটাকে ঢুকিয়ে সটান শুয়ে পড়লাম। দেখতে দেখতে এক ঝাঁক ভীমরুল শব্দ করতে করতে মাথার উপরে এসে পড়ল তারপরই একদিকে চলে গেল।

এদের ভয় না করে এমন কোন জন্তুজানোয়ার নাই। জঙ্গলের সমস্ত পশু পাখী—সব যেন প্রাণভয়ে পালিয়েছে, কারুরই আর সাড়াশব্দ নাই।

আরও চার পাঁচ মিনিট পর ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলাম। তখন ভীমরুল দলের ভোঁ ভোঁ শব্দ অনেক দূরে মিলিয়ে গেছে।

মামারু বলল, "চলুন এবার।"

শুষ্ককণ্ঠে বললাম, "চল।"

আবার নদীর দিকে চলতে লাগলাম।

একটা অপোশম একটা ছোট গাছের অপেক্ষাকৃত এক নীচু

ডালে বসে একটা ছোট পাখীর বাচ্ছা ধরে খাচ্ছিল, আমাদের দেখতে পেয়েই তিড়িং তিড়িং ক'রে তিন লাফ মেরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

মামারু আমার কাছ থেকে ছোরাখানা চেয়ে নিল, বল্‌ল, "এটা দুধ-গাছ। আসুন দুধ খেয়ে আজকের মত ক্ষিদে ত মিটিয়েনি, তারপর অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।"

বলে কি? দুধ-গাছ! গাছে তা'হলে কি দুধ জন্মায় না কি?

দু'চার কোপ মারতেই একখানা ছোট ডাল পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে গাছটার গা থেকে ফিন্‌কী দিয়ে যেন সাদা রক্ত ছুটল। অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম, সত্য সত্যই গাছটা থেকে দুধের মত এক রকম রস বেরুচ্ছে।

মামারু বল্‌লে, "শীগ্‌গির আসুন, দুধ পড়ে গেল। যতটা পারেন খেয়ে নিন্, খাঁটী দুধের মত রস এ গাছের। খুব ভাল।"

দুই করতল একত্র করে পেতে চুমুক দিয়ে আকণ্ঠ পান করলাম। মামারু সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা ডাল ভেঙ্গে ফেলে খেতে আরম্ভ করল। বাস্তবিক এ যে দুধ নয়, গাছের রস,—তা চোখের ওপর না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এ জঙ্গলের গাছপালাগুলোর ভেতরেও কত রহস্যই না আছে। ঈশ্বর এ জঙ্গলকে যেন সব কিছুই দিয়ে নির্ব্বাসিত করে রেখেছেন।

মামারুর সমস্ত গা-হাত-পা দুধ রসে একেবারে মাখামাখি

হয়ে গিয়েছিল, দন্তপাতি বিকশিত করে মুখ তুলে বলল, "আমি আর একটুখানি খেয়েনি, এ গাছ আবার যেখানে সেখানে পাওয়া যাবে না ; আপনি একটু লক্ষ্য রাখবেন ওপরের দিকে। গাছের ওপর থেকে জাগুয়ার বা প্যান্থার বা অন্য কোনও জন্তু লাফিয়ে পড়তে পারে কিন্তু।"

তীর ধনুক হাতে নিয়ে ওপরের দিকে তাকাতে লাগলাম। মামারু দিব্যি পেটটা ভর্ত্তি করে এসে হেসে বলল, "আপনি যে শুধু ওপরের দিকেই তাকাচ্ছেন, বলি পিছন থেকে বা আশপাশ থেকেও ত লাফিয়ে এসে পড়তে পারে। এ জঙ্গলের জানোয়ার-গুলো,—বিশেষ ক'রে জাগুয়ার আর প্যানথারগুলো চালাকিতে বোধ হয় মানুষকেও ছাপিয়ে যায়। দূর থেকে শীকার দেখতে পেয়ে অমনি গাছের ওপর উঠে নিঃশব্দে গাছের ডালে ডালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে এসে একেবারে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে। আর একবার লাফিয়ে যদি ঠিকমত গায়ে এসে পড়তে পারে, তা'হলে এদের আক্রমণ একেবারে অব্যর্থ। তখন আর কোনমতেই নিস্তার"—

বিরক্ত হয়ে বাধা দিয়ে বললাম, "থামারে বাপু তোর বক্তিমে। ঘাড়ে এসে পড়ে পড়বে, তা বলে কি কাঁদতে হবে এখন বসে ; যখন পড়বে, তখনকার ব্যবস্থা তখন।"

আবেগের মুখে বাধা পেয়ে মামারু চুপ করল। আমরা আবার হাঁটতে সুরু করলাম।

প্রায় দু'ঘণ্টা সমানে কাঁটাগাছ আর জঙ্গল ঠেলে ঠেলে এগিয়ে

একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু তবুও নদীর দেখা নাই। কতদূরে কে জানে!

বললাম, "মামারু, পথ ভুল করিনি ত? আর কতদূর।"

মামারু বলল, "আর বেশী দূরে নয়, আমরা ঠিক পথেই আছি।"

বাঁদিকে একটা কাঁটাঝোপের ওপাশে একটা গাছের মোটা গুঁড়ি লম্বালম্বি হয়ে পড়েছিল, দেখিয়ে বললাম, চল মামারু ঐ গুঁড়িটার ওপর ব'সে একটু বিশ্রাম করে নি, পা দুখানা যেন একেবারে লেগে গেছে।"

মামারু আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরে বলল, "শীগ্‌গির এগিয়ে আসুন, এক মুহূর্ত্ত ওখানে দাঁড়াবেন না।"

তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বললাম, "কেন রে?"

জোর পায়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মামারু বলল, "খবরদার, এ জঙ্গলে কোনো গাছের গুড়ির ওপর ভুলেও বসতে যাবেন না বলে রাখছি। ওর কোন্‌টা যে সাপ আর কোন্‌টা যে গাছের গুড়ি, এটা চেনবার উপায় নেই। এক জায়গায় একই ভাবে কতকাল পড়ে থেকে থেকে ওদের গায়ে শেওলা মাটী আবর্জ্জনা সব জমে থাকে, তখন আর সাপ বলে চেনাই যায় না। বিরাট দেহ নিয়ে নড়তে চড়তেও পারে না, সেইজন্যেই ঐ রকম গাছের গুঁড়ির মত এক একটা পড়ে থাকে। ছুটে গিয়ে জন্তুজানোয়ার ধরতে পারে না বটে, ওদের সঙ্গে চোখাচোখী একবার হলে আর পালাবার উপায় নেই। আকর্ষণী শক্তি ওদের খুবই বেশী, নিশ্বাস দিয়ে টেনে ত নেবেই,—তার ওপর এমন একটা শক্তি

ওদের ভেতর আছে, যাকে যাদুবিদ্যা বললেই চলে। ওরা শুধু চেয়ে থাকবে, আর জন্তুজানোয়ার সে যত হিংস্র আর যত দুর্দ্দান্তই হোক, ওদের মুখের ভেতর গিয়ে ঢুকতে হবে। এই সব জন্তুজানোয়ার খেয়েই ত ওরা বেঁচে থাকে। কত মানুষ যে এগুলোকে গাছের গুড়ি ভেবে বসতে গিয়ে মারা পড়েছে, তার ঠিক নেই। ওরা”.........

মামারু কথা যখন বলতে আরম্ভ করত, সহসা থামতে চাইত না, আবার মুখ যখন বন্ধ করত, তখন সহসা আবার খুলত না।

বললাম, “আচ্ছা, তুই কি বলতে চাস্, যে ওটা গাছেরগুঁড়ি নয়, সাপ ছিল।” মামারু বলল, “অসম্ভব কিছুই নয়।”

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে আরও অনেকদূর এগিয়ে জঙ্গলের ভেতর থেকেই জলের শব্দ শুনতে পেলাম। মামারু বলল, “নদীর কিনারায় ত এসে পড়লাম। এবার আর এদিক্ ওদিক্ নয়, স্রেফ্ কিনারা বেয়ে সোজা উত্তরে—তারপর যা থাকে বরাতে।”

বললাম, “সে কথা আর বলতে!”

আবার সেই রাক্ষসী নদী!—তবুও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কেমন একটা স্বস্তি পেলাম। প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল!

এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়েই আমরা কিনারা বেয়ে উত্তরমুখো হাঁটতে লাগলাম, কিন্তু মাইলখানেক যেতে না যেতেই আবার এক বিষম সমস্যা এসে উপস্থিত হ'ল। ভুস্‌ভুসে বালি আর পাঁকের ভেতর পা ব'সে যেতে লাগল, তার ওপর মাঝে মাঝে কাঁটা-ঝোপ আর দুর্ভেদ্য জঙ্গল একেবারে নদীর জলের ভেতর পর্য্যন্ত

নেমে এসেছে। সেগুলো ঠেলে এগিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়, আবার কুমীর আর মানুষখেকো সাপের ভয়ে হাঁটুজলে নামতেও যে গা ছম্ ছম্ করে।

মামারু বলল, "এই ভীষণ কাঁটাবনের ভেতর দিয়ে পথ তৈরী ক'রে এগোনো হয়ত সম্ভব হত, যদি উপযুক্ত অস্ত্র আমাদের সঙ্গে থাকত, কিন্তু এখন উপায় ?"

নদীর কিনারায় ব'সে দু'জনেই মাথায় হাত দিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম।

মামারু বলল, "আসুন, এক কাজ করা যাক। খালের মোহানা এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়। ঐ যে বাঁশের জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, আসুন কতকগুলো বাঁশ জড়ো ক'রে আমরা একখানা ভেলা তৈরী ক'রে ফেলি। কোমর জলে লগি ঠেলে ভেলাখানাকে কোনমতে মোহানা পর্য্যন্ত নিতে পারলে, ওখান থেকে যেতে বিশেষ আটকাবে না। এর চেয়ে কিছু ভাল উপায় এখন আছে ব'লেত মনে হচ্ছে না।"

পূর্ব্বেই বলেছি, ভাবনা চিন্তার কতকটা বাইরে চ'লে গিয়েছিলাম। দ্বিরুক্তি না ক'রে কোনমতে কাঁটাঝোপ সরিয়ে সরিয়ে বাঁশের জঙ্গল থেকে কয়েকটা বাঁশ দুজনে টেনে বার করলাম। আনুসঙ্গিকের অভাব এ জঙ্গলে নাই। অজস্র লতা যেখান দিয়ে সেখান দিয়ে ঝুলছে। দড়ির চেয়েও শক্ত ওগুলো।

কতকগুলো বাঁশ জলে ভাসিয়ে লতা দিয়ে সেগুলোকে

পর পর সাজিয়ে বেঁধে ফেললাম। দুই ঘণ্টার পরিশ্রমে সুন্দর ভেলা তৈরী হ'য়ে গেল।

দুখানা ছোট বাঁশ কায়দা করে কেটে লগি তৈরী ক'রে নিয়ে আমরা আবার সেই নদীর বুকে ভাসতে লাগলাম, একখানা বাঁশের ভেলার ওপর।

আজ আমরা দুজনে এই নদীর বুকে ভেসে চলেছি, কিন্তু গতকাল আমরা এমনি সময়ে ছিলাম ছয়জন। আগামী কাল এমনি সময়ে ?........ ...কিন্তু সে এখন থাক্।

— বার —

এ আবার কি বিপদ রে—ভগবান্! বিপরীত স্রোত বটে, কিন্তু আমরাও ত সমান দুইজন মানুষ! প্রাণপণে লগি ঠেলেও যেন একহাত এগোতে পারছি না। ভেলাখানাকে কে যেন প্রাণপণ শক্তিতে পিছনে টেনে রেখেছে। বললাম, "মামারু, এভাবে আর কতক্ষণ পরিশ্রম করতে পারবি ? দম ত ফুরিয়ে আস্‌ছে, এ ভাবে আর" ....

লগি মাটীতে লাগিয়ে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে ঠেলে ধ'রে মামারু বলল, "এ ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নেই। এ ভাবে বেয়ে মোহানা পর্য্যন্ত যেতেই হবে আমাদের।"

শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে আমরা উন্মত্তের মত

লগি হাতে বিপরীত স্রোতের সঙ্গে লড়তে লাগলাম। ভেলাখানা যেন এতক্ষণে একটু একটু ক'রে এগোচ্ছে মনে হ'তে লাগল।

মামারু পাগলের মত লাফিয়ে উঠে লগি শূন্যে তুলে দ্বিগুণ জোরে জলের ভেতর ফেলে চীৎকার ক'রে বলল, "ভেল্লা চলেছে এবার—জোরে আরও—আরও জোরে লগি মারতে হবে। পারব—আমরা ঠিক পারব মোহানায় পৌঁছে যেতে।"

মামারুর তখন অন্য মূর্ত্তি,—তার সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখে আমার ভাঙ্গা বুকে যেন নতুন সাহস পেলাম। বাস্তবিক মানুষ যে কত অসাধ্য সাধন করতে পারে, ঠিক এই রকম চরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত না হ'লে তা বুঝবার উপায় নাই।

কিন্তু সকলের ওপরে একজন যিনি আছেন, তাঁর ইচ্ছা—তাঁর উদ্দেশ্য সব সময় আমরা ত বুঝতে পারি না। মনে হয় এ যেন তার পাগলামীর খেয়াল। কেন তবে বলি।

প্রায় সিকি মাইল এভাবে চলেছি। শরীর একেবারে অবশ হ'য়ে এসেছে, শরীরের ওপর দিয়ে যেন ঘামের স্রোত ব'য়ে চলেছে, কিন্তু আমাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। যতক্ষণ মোহানায় পৌঁছুতে না পারব, ততক্ষণ আমরা একেবারে পাগল দিশেহারা।

কিন্তু এ কি? চল্‌তি ভেলাখানা যেন একটা ধাক্কা খেয়ে থম্‌কে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা দম্‌কা হাওয়া এসে আমাদের গায়ে লাগল।

এক মুহূর্ত্ত নদীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, নদী এর ভেতরই

রীতিমত চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। হাওয়াটা স্রোতের প্রতিকূলেই বইছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একখণ্ড কালো মেঘ যেন সমস্ত আকাশে কালিগোলা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

মামারু এক ঝলক দেখেই অবস্থাটা বুঝে নিল। বলল, "ভেলা একেবারে কূলে নিন। কিনারায় গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলি আগে। ঝড় উঠেছে।

দেখতে দেখতে নদীর জলের গর্জ্জন আর নাচন আরম্ভ হ'ল। ওপর থেকে দু'চার ফোঁটা জলও এসে গায়ে পড়ল। ভেলাখানা কিনারা দিয়েই চালাচ্ছিলাম, তাড়াতাড়ি একেবারে কূল ঘেঁসে লাগিয়ে মোটা লতা দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম।

মামারু বলল, "ঢেউয়ের বাড়ির চোটে এখানে দাঁড়ান যাবে না, ভেলার উপর দাঁড়িয়ে থাকাও অসম্ভব, আসুন আমরা জঙ্গলের ভেতর গিয়ে দাঁড়াই। ঝড় থামলে আসব।"

বলতে বলতে গাছপালা ভেঙ্গে ঝড় ধেয়ে এল। আর সেই সঙ্গে মুষলধারে জল, যেন জলে-জঙ্গলে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। আমরা কিনারা ছেড়ে একেবারে কাঁটাগাছের জঙ্গলের ভেতর গিয়ে দাঁড়ালাম। নদীর প্রলয়-গর্জ্জন আর তাণ্ডব নৃত্য, সেই সঙ্গে ঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দ সমস্ত প্রকৃতিকে যেন তোলপাড় করে তুলল।

প্রায় আধঘণ্টা মাতামাতি করে ঝড় থেমে গেল। আমরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে ভেলাখানার দিকে তাকাতেই একেবারে 'থ' হ'য়ে গেলাম। ভেলাখানা নদীর ঢেউএর তালে তালে নাচছে

আর এক একবার কিনারায় এসে ঘা খেয়ে যেন আর্ত্তনাদ করে উঠছে, সমস্ত বাঁশগুলোতে ঠোকাঠুকি লেগে এক রকম শব্দ হচ্ছে ; আর ভেলাখানার উপর বড় বড় তিনটে কুমীর পরম নিশ্চিন্তে হাত পা ছড়িয়ে নদীর দিকে মুখ ক'রে বসে আছে, যেন দোল খাচ্ছে। দেখেই ত আমাদের চক্ষুস্থির।

বললাম, "এ আবার কি বিপদ মামারু ? আমাদের ভেলা যে ওরাই দখল করে বসে আছে !—এখন উপায় ?"

মামারু কুমীর তিনটের রকম দেখে রাগে দাঁত কিড়িমিড়ি করছিল, বল্‌লে, "বার করছি ওদের ভেলায় চড়া।" বলেই কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে লম্বা বাঁশের লগির গোড়া দিয়ে মারলে একটা কুমীরের পিঠের উপর জুতসই এক ঘা।

কুমীরগুলো নিশ্চিন্ত মনে এতক্ষণ ওদিকে মুখ করে বসেছিল। এবার হঠাৎ এক লগির ঘা খেয়ে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়েই আমাদের দেখতে পেল। দেখে তাদের মনের অবস্থা কি হ'ল বলতে পারব না, তবে মামারু আর একবার লগি উঁচু করতেই দু'পাশ থেকে দুটো দিলে জলে ঝাঁপ, কিন্তু মাঝখানের কুমীরটা বোধ হয় একটু অন্য প্রকৃতির ছিল, কারণ সে সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট 'হা' করে রাগের মূর্ত্তিতে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

কি ফ্যাসাদ। গায়ের উপর এসে পড়বে না ত! কি মূর্ত্তি রে বাবা ! মামারু কিন্তু চকিতে এক রীতিমত কীর্ত্তি ক'রে বসল। ভেবেছিলাম, সে বিষাক্ত তীর ওটার মুখের ভেতর

চট্ ক'রে কুমীরটার প্রকাণ্ড মুখের ভেতর বাঁশের সুতীক্ষ্ণ আগা······(পৃঃ ৭৭)

ছুঁড়বে, কিন্তু তা না করে সে লগির ছুচলো আগাটা সড়কীর মত ক'রে ব্যবহার করল ; চট্ ক'রে কুমীরটার প্রকাণ্ড মুখের ভেতর বাঁশের সুতীক্ষ্ণ আগা এত জোরে ঠেসে ধরল যে মনে হ'ল সেটা ওর মুখের ভেতর দিয়ে পেটের নাড়ীতে গিয়ে বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাক ছেড়ে, 'ছেড়ে দে রে কেঁদে বাঁচি'—এই রকম ভাব ক'রে কুমীরটা কোনমতে হুড়মুড় ক'রে জলে লাফিয়ে প'ড়ে পালাল। আমরা হো হো ক'রে হেসে উঠলাম।

তাড়াতাড়ি ভেলাখানা খুলে আবার আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে কিনারা ঘেঁসে চালাতে লাগলাম। ভেলা যেন চল্‌তেই চাইছে না; জরাজীর্ণ বৃদ্ধের মত যেন এক পা এক পা করে এগুচ্ছে।

মামারু বল্‌ল, "এভাবে এগোতে পারলেও আমাদের মার নেই, মোহানা পেতে আর কতক্ষণ !"

বললাম, মোহানায় পৌছেই ত আর আমরা জঙ্গল থেকে বেরুতে পাচ্ছিনে। সেখান থেকেও খালের উজানস্রোতে তিন চারিদনের পথ, তারপর না হয় সরু পাহাড়ী রাস্তা পাওয়া যাবে। কিন্তু এই স্রোত ঠেলে সারা রাস্তা যাওয়া কি সম্ভব হবে মামারু ?"

মামারু বলল, "কিন্তু খালের দু'পাশে যে অন্ধকারময় জঙ্গল আমরা পথে দেখে এসেছি, তার ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ত সম্ভব হবে না।"

দু'জনে ভেলার দু'পাশে দাঁড়িয়ে লগি মাটীতে মারছি আর প্রাণপণে ঠেলে একটু একটু ক'রে এগুচ্ছি, হঠাৎ সুমুখে নজর

পড়তেই আমাদের দু'জনেরই আক্কেল একেবারে গুড়ুম হ'য়ে গেল।

একটা প্রকাণ্ড তালজাতীয় গাছ জলের তোড়ে পাড় ভেঙ্গে গোড়া উপ্‌ড়ে একেবারে নদীর ভিতর গিয়ে পড়েছে; গাছটার গোড়া থেকে খানিকটা জলের উপর জেগে আছে, বাকী অংশ নদীর জলের ভেতর।···একটা প্রকাণ্ড সাপ সেটার গুঁড়ির উপর লম্বালম্বি হ'য়ে পড়ে আছে, সম্ভবতঃ জলের ভেতর শীকার ধরবার আশায় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমাদের শব্দ পেয়েই সাপটা আমাদের দিকে মুখ উঁচু করে ফিরলো। আমরা ভেলাখানা যেভাবে বেয়ে নিচ্ছি, তাতে তার একেবারে মুখের কাছ দিয়ে আমাদের যেতে হয়। আমাদের ব্যবধান বোধ হয় ত্রিশহাতও এখন নয়। আমরা দু'জনেই লগি কিনারার মাটীতে ঘা দিয়ে গভীর জলে ঠেলে দিলাম, উদ্দেশ্য সাপটার হাত এড়িয়ে ওপাশে গিয়ে আবার কিনারা ধরব, কিন্তু ভেলাখানাকে সেই যে অথৈজলে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ঠেলে নিলাম, সেই হ'ল আমাদের কাল।

সাপটার কবল থেকে অব্যাহতি পেলাম বটে, কিন্তু সেই গভীর জল থেকে এত চেষ্টা করেও ভেলাখানাকে আর কিনারায় আন্‌তে পারলাম না। সঙ্গে বোঠে নাই, অথৈজলে লগি মাটী পায় না,—ভেলাখানা স্রোতের টানে, ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে নাচতে যে পথ ধরে এতখানি এলাম, সেই পথেই ভাসিয়ে নিয়েই চল্‌ল।

আমি 'হায় হায়' করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। মামারু লগিটাকেই বোঠের মত করে বেয়ে ভেলাখানাকে কিনারায় আনতে এত চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু প্রবল স্রোতের মুখে সবই বৃথা,—স্রোতের গায়ে গা ভাসিয়ে দিয়ে বাঁশের প্রকাণ্ড ভেলাখানা অসহায় দুটো মানুষকে বুকে করে কোন্ অজানার উদ্দেশ্যে ছুটে চল্‌লো। আধঘণ্টা প্রাণপণ শক্তিতে বেয়ে যতটা পথ উজান বেয়ে এসেছিলাম, বোধ হয় পাঁচ মিনিটেই সে পথ পেরিয়ে অনুকুল স্রোতে ভেসে চললাম।

মামারু লগিটাকে ভেলার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল, আমি সটান শুয়ে পড়লাম। উপরে সদ্য মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ আমাদের দিকে তাকিয়ে তখন যেন বিদ্রূপের হাসি হাসছে, আর অনন্ত জলরাশি নানারকম সুরে গর্জ্জন ক'রে নানারকম মূর্ত্তিতে যেন ভ্রূকুটী করে বল্‌ছে, "ওগো মুসাফির! এবার?"

— তের —

"মামারু"……

"হুজুর"……

চোখ বুজে সটান লম্বালম্বি হয়ে শুয়ে প'ড়েছিলাম, বললাম, "আমরা এখন নদীর কোন্‌দিকে ?"

মামারু যেন অপরাধীর মত কাঁপা গলায় বললে, "আজ্ঞে, নদীর মাঝখান দিয়েই টানা স্রোতে ভেসে চলেছি।"

বললাম, "এখন কি কোনই উপায় আর নেই ?"

এক মিনিট, ছ'মিনিট করে দশ মিনিট কেটে গেল, মামারুর কাছ থেকে কোন উত্তরই এল না, বুঝলাম, উত্তর দেওয়ার মত তার কোন কথাই নেই।

আবার বললাম, "শুধু শুধু আর কেন মুখ কালো করে বসে আছিস্‌ মামারু, আমার মত শুয়ে পড়্‌। মাথায় হাত দিয়ে কতক্ষণ—ক'ঘণ্টা—ক'দিন বসে থাকতে পারবি, তাই বল্‌! তার চেয়ে, চেয়ে দেখ্‌, কি সুন্দর আকাশ, কি সুন্দর বাতাস, কি সুন্দর নদীর জলের বিচিত্র সুরের গান! আয় আমরা ঐ আকাশের পানে তাকিয়ে এই গান শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়ি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের এ ঘুম যেন আর না ভাঙ্গে।"

মামারু আমার কথা শুনে যেন আবার একটু উত্তেজিত হ'য়ে

উঠল, বল্‌লে, "জীবনের ভয় মোটেই করিনে হুজুর, সেজন্যে আমার এতটুকু ভাবনা নেই। আমি কেবল ভাবছি আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা। কি আশ্চর্য্য! সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় আমাদের মরণের মুখে আশ্রয় নিতে হবে। নিরুপায়, একেবারে নিরুপায়!"

নিরুপায়!—বলে কি?—নিরুপায়?

মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এ কি কথা!—আমাজনের যাত্রী নিরুপায় হ'য়ে মরণকে আলিঙ্গন করবে অসহায়ের মত? না—কখনই না—কিছুতেই না!

লাফিয়ে উঠে বসলাম, চেয়ে দেখলাম, ভেলাখানা স্রোতাবর্ত্তে প'ড়ে মাঝখান দিয়ে মোচার খোলার মত নাচতে নাচতে আমাদের নিয়ে ছুটেছে। দুপাশে জঙ্গল মোটা কালোপর্দ্দার মত দেখা যাচ্ছে।

গম্ভীর স্বরে বললাম, "মামারু উ-ই যে কিনারা দেখা যাচ্ছে, চল্‌ সাঁতরে গিয়ে উঠব। এখানে এভাবে না খেয়ে দিনের পর দিন শুকিয়ে মরতে পারবনা। হয়ত পাঁচশ মাইলের উপর ভেলা এভাবে ভেসে চলবে।"

"কিন্তু এ কুমীর ভর্ত্তি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েই বা কি লাভ হুজুর! জেনে শুনে কুমীরের মুখে মাথা ঢুকিয়ে দেওয়া,—এই বা কিভাবে পারা যায়!—চলুন—ভেসে ত চলি, তারপর বরাতে যা আছে তাই-ই হবে।"

"বেশ, তাই চল্‌!"—বলেই আবার শুয়ে পড়লাম।

মামারু কিন্তু স্থির নির্ব্বাক নিশ্চল হ'য়ে একইভাবে ব'সে রইল।

সমস্ত রাত মাথার উপর ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না, মাঝে মাঝে মেঘঢাকা অন্ধকারের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝিলিমিলি, সমস্ত দিন মাথার উপর কাঠফাটা রোদ, মাঝে মাঝে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ বৃষ্টি ;—একদিন, দু'দিন, তিনদিন, চারদিন, ক্রমে পাঁচদিন কেটে গেল। ভেসে চলেছি ত চলেছিই। অনাহারে শরীর একেবারে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে। গলা যখন একেবারে শুকিয়ে যায়, তখন অতিকষ্টে হাত বাড়িয়ে একটু নোনা জল মুখের ভিতর দিয়ে গলা ভিজিয়ে নি। কিন্তু পাঁচদিন ত একরকম ক'রে কাটল, আর যে চলেনা। অনাহারে শুকিয়ে তিলে তিলে মরণ যন্ত্রণা-ভোগ—এ যে কত বড় শাস্তি, একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া কেউই তা বুঝবেনা। এ অজানা পথের শেষ যে কোথায়, কোথায় যে আমরা ভেসে চলেছি, একমাত্র জগদীশ্বর ছাড়া কে আর জানে!

ছয়দিনের দিন সকালে উঠে বসতেও যেন আমার কষ্ট হ'তে লাগল। মামারুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বেচারী না খেতে পেয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। আমায় উঠে বসতে দেখে একবার মুখ ফিরিয়ে করুণ নয়নে তাকিয়ে রইল। সে দৃষ্টির অর্থ আমি বুঝলাম।

অতি কষ্টে বললাম, "মামারু, সময় থাকতে যদি ভেলা ছেড়ে দিয়ে সাঁতরে কিনারায় গিয়ে উঠতাম, তা'হ'লে এ দুর্দ্দশা

আজ আমাদের হ'তনা। কিন্তু এখন যে সাঁতরে দু'হাতও যাব, শরীরের সে অবস্থা ত নেই।”

হঠাৎ শোঁ ক'রে কি একটা যেন মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। তাকিয়ে দেখলাম একটা তীর,—নদীর ভেতর কয়েক হাত তফাতে গিয়ে টুপ ক'রে পড়ে ডুবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, দুখানা ইণ্ডিয়ান দস্যুদের ছিপ্ এদিকেই আস্‌ছে। স্রোতের মুখে কাঠের ডোঙ্গা জোরে চালিয়ে নদীর মাঝখান দিয়ে আমাদের পিছন পিছন এদিকেই এগিয়ে আস্‌ছে।

এক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে দেখেই আগাগোড়া ব্যাপারটা বুঝে নিলাম। ব'সে ছিলাম,—শুয়ে পড়লাম। মামারুর দিকে তাকিয়ে বললাম, “ঈশ্বর আর বেশী কষ্ট আমাদের দিলেন না মামারু, ঐ দেখ্ কারা আসছে আমাদের একেবারেই উদ্ধার করতে।”

ততক্ষণে আরও দুটো তীর আশে পাশে জলের ভেতর এসে পড়ল। মামারু শুয়েছিল, উঠে বসে একবার তাকিয়ে দেখল, তারপরই কাঁপতে কাঁপতে ভেলার উপর উঠে দাঁড়াল শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম মামারু হাত পা নেড়ে তাদের তীর ছুঁড়তে নিষেধ করছে, আর কেবলই পেটে হাত দিয়ে দেখাতে চাইছে যে ‘আমরা বড়ই ক্ষুধার্ত্ত—না খেয়ে মরছি। আমাদের উদ্ধার কর।’

তীর ছোঁড়া তারা সত্যিসত্যিই বন্ধ করল, সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় দুই মিনিটের মধ্যেই দু'খানা ডোঙ্গাজাতীয় কাঠের

নৌকো আমাদের ভেলার ত্ব'পাশে এসে ভিড়লো। একবার তাকিয়ে দেখলাম, এক এক নৌকোয় তিনজন ক'রে জংলী। কি বিশ্রী এবং ভীষণ দর্শন ওরা, দেখেই যেন যমদূত ব'লে মনে হয়। সত্যিকার দস্যুর চেহারা বটে। গায়ের রং ঘোর তামাটে, উলঙ্গ বললেই চলে একটু কটিবাস কোনমতে পরিধানে রয়েছে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে পাখীর পালক গুঁজে দিয়ে বেঁধে রেখেছে, হাতে গলায় কুমীরের দাঁত ও জন্তুজানোয়ারের হাড়ের গয়না পরা, হাতে বড় বড় ধনুক আর গাছি গাছি বিষমাখা তীর। যেন এ নদীর রাজা এরা। সেদিন একটা বন্দুক, এক ব্যাগভর্ত্তি কার্টিজ ও খাবার দিয়ে এমনি একটী দলকে মামারু বিদায় ক'রেছিল।.........

মামারু অসভ্যদের সর্দ্দারের কাছে ওদের ভাষায় সম্ভবতঃ আমাদের এই দুর্ভাগ্যের কথাই কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল।

সর্দ্দার আমাদের ভেলায় উঠে এল, তারপর আমার ওপর একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে তাকাল। অসভ্যদের ভেতর একটা রীতি বরাবর লক্ষ্য ক'রেছি। উপহার হিসেবে কিছু পেলেই ওরা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়। শেষ সম্বল ছোরা-খানার কথা আমার মনে পড়ল। অতিকষ্টে উঠে ব'সে সর্দ্দারকে সেখানা হাত বাড়িয়ে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দিন অনাহারে একেবারে মিশিয়ে যাওয়া পেটটা হাত দিয়ে দেখালাম। ইঙ্গিতে কিছু খাবারও চাইলাম! যতই নিষ্ঠুর হোক্, মানুষ ত বটে, বিশেষ করে দলের সর্দ্দাররা সাধারণতঃ

দু'খানা ডোঙ্গাজাতীয় কাঠের নৌকো আমাদের······(পৃঃ ৮৩)

একটু নরম প্রকৃতির হ'য়ে থাকে, তাদের হৃদয়ে দয়ার পরিচয় কিছু পাওয়া যায়। সর্দ্দার সম্ভবতঃ আমাদের অসহায় অবস্থা বুঝতে পারল। দলের একজনকে কি ইসারা করতেই সে দুখণ্ড আধপোড়া আধকাঁচা কিসের মাংস আমাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমরা ক্ষুধার্ত্ত জানোয়ারের মত তাই লুফে নিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলাম।

সর্দ্দারকে মামারু সমস্ত বৃত্তান্তই খুলে বলছিল। সর্দ্দার আমাদের দুজনকে এবার ভেলা ছেড়ে দিয়ে ওদের নৌকোয় উঠতে বল্‌লে। প্রথমটা অবশ্য অন্য রকম ধারণা করেছিলাম, কিন্তু মামারু আমায় বুঝিয়ে দিল, তা নয়। ওরা দয়া ক'রে আমাদের কিনারায় পৌঁছে দিচ্ছে।

অসভ্যদের ছিপ দুখানা আমাদের জলের রাজ্য থেকে জঙ্গলের রাজ্যে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত্তেই তাদের দ্রুতগামী নৌকো দুখানা স্রোতের মুখে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

জঙ্গল! জঙ্গল!! আবার সেই অন্ধকারময় জঙ্গল!!!

বললাম, "মামারু, এবার? এই ক'দিনে সেই মোহানা থেকে না হোক্ পাঁচশ মাইল দূরে এসে পড়েছি, এবার?"

মামারু বল্‌ল, "খিদেয় দাঁড়াতে পারছি না। আসুন কিছু খাবারের জোগাড় আগে করি, পরে অন্য কথা।"

জঙ্গলের ভেতর কয়েক পা এগিয়েই দেখতে পেলাম, অগুন্তি গাট্টাপার্চ্চা গাছ, সরু লম্বা লম্বা গাছগুলোর সর্ব্বাঙ্গ থাকে থাকে কে যেন কেটে রেখেছে।

মামারু বললে, "গাছগুলো থেকে রস বার করবার জন্যে কারা যেন সত্য কেটে রেখেছে, নিশ্চয়ই এখানে রবার চাষীর দল কাছে কোথায় আছে, আসুন আমরা খোঁজ করে দেখি।"

বলতে না বলতে দেখলাম, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একদল লোক এদিকে এগিয়ে আসছে। লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, যা অনুমান করেছি, ঠিক তাই, একদল অর্দ্ধসভ্য রবার চাষী সঙ্গে দু'জন শ্বেতকায় বন্দুকধারী। কাছে আসতেই চিনলাম, দু'জনই আমেরিক্যান্।

এই ক'দিনে আমায় আর কোন সভ্য মানুষ বলে চেনাই যাচ্ছিল না, তবু তাঁরা আমার কাছে এসে চিনতে পারলেন। পরিচয় দিয়ে আমাদের পথের কাহিনী তাঁদের বললাম। সঙ্গে সঙ্গে কি ব্যবহার তাঁদের! পোষাক বদলে ফেলে তাদের দেওয়া নতুন পোষাক পরলাম। খাবারের আয়োজনেরও কোন ত্রুটী হল না। আমরা আবার যেন নতুন জীবন পেলাম।

জিজ্ঞেস করে জানলাম, এ শাখানদী গিয়ে মূল আমাজনে মিশেছে, মোহানা এখান থেকে দু'মাইলও নয়। এখান থেকে আধমাইল দূরে এঁদের দু'খানা ষ্টীমার এই নদীর ঘাটেই বাঁধা রয়েছে। রবার বোঝাই হচ্ছে। একখানা কালই ছেড়ে যাবে।

পরদিন সকালে সূর্য্যদেব যখন জঙ্গলের মাথার ওপর লাল রং মেখে লাফিয়ে উঠলেন, তখন আমাজনের বুক চিরে প্রকাণ্ড ষ্টীমারখানা গর্জ্জন করতে করতে আমাদের নিয়ে ছুটেছে।

সমাপ্ত